

যেখানে দেখিবে ছাই...

অভীক দত্ত

যেখানে দেখিবে ছাই

অবীক দত্ত

আদরের নৌকা

JEKHANE DEKHIBE CHAI
by Abhik Dutta

প্রচ্ছদঃ লেখক
প্রকাশক ও কপিরাইটঃ আদরের নৌকা
যোগাযোগঃ adorernauka@gmail.com

।।পর্ব ১- একুশ বছর বোধ হয়।।

"পোস্টমর্টেম রিপোর্ট বলছে ভারী কোন কিছু দিয়ে অতর্কিতে মাথার পিছনে মারা হয়েছে। কী দিয়ে মারা হয়েছে সেটা এখনও খুঁজে পাওয়া যায় নি, তবে অনুমান করা হচ্ছে পাথর জাতীয় কিছু। খুন হওয়া মহিলার ওজন সাতচল্লিশ থেকে আটচল্লিশের মধ্যে ছিল। উচ্চতা পাঁচ ফুট আড়াই ইঞ্চি। খুনীর উচ্চতা মৃতার উচ্চতার থেকে বেশি। অন্তত প্রাথমিকভাবে তাই মনে হচ্ছে"।

রিপোর্টটা পড়ে শোনালেন ইন্সপেক্টর রায়।

উপমন্যু চোখ বন্ধ করে শুনছিলেন। বললেন "বয়স কত?"

ইন্সপেক্টর রায় বললেন "আই কার্ড উদ্ধার হয়েছে। জন্ম সাল সাতানব্বই"।

উপমন্যু বললেন "একুশ বছর বোধ হয়?"

ইন্সপেক্টর হাসলেন "হ্যাঁ"।

উপমন্যু বললেন "মোবাইল উদ্ধার হয়েছে? কার কার সঙ্গে কথা বলেছে দেখেছেন?"

ইন্সপেক্টর বললেন "উদ্ধারের পর দেখা গেছে রিসেট করা হয়েছে মোবাইলটা। ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাওয়া যায় নি কোন"।

উপমন্যু হাসলেন, "বাহ, শাইনিং এন্ড ডিজিটাল ইন্ডিয়া। ইন্টারেস্টিং। আই কার্ডে আশা করি ঠিকানা দেওয়া আছে। কোথাকার লোক ইনি?"

ইন্সপেক্টর বললেন "শিলিগুড়ির মেয়ে। কলকাতায় পিজিতে ছিল ঢাকুরিয়ায়। সাউথ কলকাতার একটা কলেজে থার্ড ইয়ার পড়ছিল। একই সঙ্গে একটা কল সেন্টারে চাকরিও করছিল। ঢাকুরিয়ার বাড়িতেই যাব এবার। আপনি যাবেন?"

উপমন্যু বললেন "যাব। আমাকেই যখন দেখতে হবে কেসটা তখন যেতে তো হবেই। চলুন"।

ডিপার্টমেন্ট থেকে বেরোলেন দুজনে। উপমন্যু বললেন "আপনি মনে হয় না বেশি সময় দিতে পারবেন বলে। থানার অন্যান্য কাজও তো আছে"।

রায় হাসলেন "হ্যাঁ। আপনারা হ্যান্ড ওভার নিয়ে নিলে তারপরে আমার কাজ শেষ"।

উপমন্যু গাড়িতে উঠে ড্রাইভারের পাশে বসে একটা সিগারেট ধরালেন।

রায় ড্রাইভারকে ঠিকানা বলে দিলেন। গাড়ি স্টার্ট নিল।

উপমন্যু বললেন "সময় বদলেছে বুঝলেন? আজকালকার দিনে একটা মোবাইলের থেকে গুরুত্বপূর্ণ আর কিছু হয় না। মেয়েটির মোবাইলে যা ছিল সব চাই আমার। আমাদের সাইবার ডিপার্টমেন্টে পাঠিয়ে দিন যন্তরটি"।

রায় বললেন "সে আগেই দিয়ে দিয়েছি। পেয়ে যাব আজ রাত অথবা কাল সকালের মধ্যে"।

উপমন্যু বললেন "গুড। এখন সব দপ্তরের থেকে এই দপ্তরেই জোর দিতে হবে যা দিনকাল আসছে। মানুষ তো মোবাইলটাকেই নিজের ধ্যান জ্ঞান করে রেখে দিয়েছে। কোন দিকে যাবেন"?

রায় বললেন "তা বটে। তবে দাগী লোকেরাও কম যায় না। কাল বি এম জুয়েলারসে ডাকাতি করতে গিয়ে দ্য গ্রেট লক্ষণ প্রামাণিক ধরা পড়েছে। ব্যাটাকে গাঁজা কেস দিয়ে ঢুকিয়ে দিয়েছি আপাতত"।

উপমন্যু বললেন "বটে? ধরলেন কী করে?"

রায় বললেন "ব্যাটার ভাগ্য খারাপ ছিল আর আমাদের কপাল ভাল ছিল বলতে পারেন। টহলদারী জিপটার ওই সময় ওই অঞ্চলে যাওয়ার কথা ছিল না। একটা পেটি কেসে বস্তিতে ঝামেলা মিটিয়ে ফেরার পথে গাড়ি পাংচার হয়ে যায় দোকানটার সামনেই। শাটার যেমন নামানো থাকে তেমনই ছিল। ড্রিল মেশিনের শব্দ পেয়ে সন্দেহ হওয়ায় আমাদের সেকেন্ড অফিসার বর্মণ ফোরস নিয়ে শাটার তুলতেই দেখে এক্কেবারে জলজ্যান্ত লক্ষণ প্রামাণিক। বিন্দুমাত্র প্রতিরোধটুকুও করে নি। ব্যাটা ভাবতেই পারে নি"।

উপমন্যু বললেন "সে কী! দোকানের সিকিউরিটিগুলো কোথায় ছিল?"

রায় বললেন "লক্ষণেরই লোক ছিল। দু মাস আগে সে দোকানে ঢুকেছিল। খুব তাড়াতাড়ি বিশ্বস্ত হয়ে উঠেছিল। অনেক প্ল্যান করেছিল বেচারা। শেষ পর্যন্ত কপাল মন্দ..."
উপমন্যু বললেন "কপাল মন্দ বলে মন্দ? ড্রিল মেশিনের শব্দ কে পেয়েছিলেন? বর্মণ?"
রায় বললেন "হ্যাঁ। বর্মণের একেবারে কুকুরের কান"।
উপমন্যু খুশি হলেন "এই তো চাই। পুলিশের নাক কান কুকুরের মত না হলে চলে নাকি?"
রায় বললেন "তবে রাত বলেই ড্রিলের শব্দটা পেয়েছিল স্যার। চারপাশে শব্দ থাকলে বেঁচে যেত লক্ষণ"।
উপমন্যু বললেন "তা বটে। সবটাই তো লাক ফ্যাক্টার ভাই। মানুষের জীবনটাই তো নির্ভর করে আছে এর ওপরে"।
গাড়ি একটা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। উপমন্যু বললেন "এই কি সেই বাড়ি নাকি?"
রায় বললেন "হ্যাঁ চলুন"।
দোতলা একটা বাড়ি। বাড়ির অবস্থা বিরাট কিছু নয়। তবে এককালে ভাল অবস্থা ছিল সেটা বোঝা যায়। রং শেষ কবে করা হয়েছিল বোঝা সম্ভব নয়।
রায় কলিং বেল টিপলেন।
মিনিট দুয়েক পরে এক দীর্ঘকায় গৌরবর্ণ বৃদ্ধ বেরিয়ে এসে বললেন "থানা থেকে এসেছেন তো? আসুন"।
দুজনে বাড়ির ভিতরে ঢুকলেন।
বৃদ্ধ বসার ঘরে এসে একটা সোফায় বসে বললেন "বসুন। আমি শারীরিকভাবে খুব বেশি সক্ষম নই। আগে বসে পড়লাম। মার্জনা করবেন আমায়"।
উপমন্যু হাসলেন "না না। ঠিক আছে। এই বাড়িতে আপনি একা থাকেন না নিশ্চয়ই?"
বৃদ্ধ বললেন "আমি নিচের ঘরে থাকি। পাশের ঘরে আমার ছোট ছেলে আর ছেলের বউ। দোতলায় একটা ঘরে জয়িতা, আরেকটা ঘরে নীলম বলে একটা মেয়ে থাকে। অবশ্য জয়িতাকে এখন আর থাকে বলাটা..."
রায় বললেন "আপনার ছেলে আর তার স্ত্রী?নীলমই বা কোথায়?"
বৃদ্ধ বললেন "ছেলে আর ছেলের বউ দুজনে চাকরি করে। আসবে হয়ত ঘন্টাখানেক বাদে। নীলম যাদবপুরের এক স্কুলে পড়ায়। ফিরে আসবে যে কোন সময়"।
উপমন্যু বললেন "আমাকে একটু জয়িতার সম্পর্কে বলবেন? যতটা জানেন"।
বৃদ্ধ চোখ বন্ধ করলেন। কিছু কথা একবারে বলবেন বলে মনঃসংযোগ করলেন হয়ত।

।।পর্ব ১- একুশ বছর বোধ হয়।।

২।

"আমার নাম সুশান্ত হালদার। এ বাড়ি আমারই বানানো। আমি কাজ করতাম সেলস ট্যাক্সে। কেরাণি ছিলাম। পৈতৃক বাড়ি। ছিল কুড়েঘরের মত। আমি পাই পয়সা জুড়ে বাড়িটা করি। ধান ভানতে শিবের গীত শুনতে সমস্যা নেই তো অফিসার?" বৃদ্ধ উপমন্যুর দিকে তাকালেন।
উপমন্যু বললেন "একেবারেই নয়। আমার হাতে অঢেল সময়। তবে রায় চাইলে চলে যেতে পারো"।
ইন্সপেক্টর রায় বললেন "না না স্যার। আপাতত কোন ইমারজেন্সী নেই। থাকলে আমি চলে যাব না হয়"।
উপমন্যু বৃদ্ধের দিকে তাকালেন "আপনি স্বচ্ছন্দে বলতে পারেন"।
সুশান্তবাবু বললেন "আমার দুই ছেলে। বড় রাজেন্দ্র হালদার বছর দশেক আগে দিল্লিতে পাড়ি দেয়। তার এক ছেলে, এক মেয়ে। আমাদের সঙ্গে বিশেষ কোন যোগাযোগও নেই। ছোট, মানে যে এ বাড়িতে থাকে, বিশ্বজিৎ হালদার, সে কাজ করে হাওড়ার এক সরকারি অফিসে। আমার বউমাও একই অফিসে চাকরি করেন। ওরা নিঃসন্তান। দুজনে একসঙ্গে যায়, আসে। বছর তিনেক আগে আমার প্রাতঃভ্রমণের সঙ্গী জয়ন্ত জানাল তার ছেলে তার বাড়িতে এরকম পিজির ব্যবস্থা করেছে। দুজন ছাত্রী থাকবে, খাবে, টাকাও দেবে।

শুনে আমি বিশ্বজিৎ এবং আমার বউমা তমালিকার সঙ্গে কথা বলি। দুজনেই সানন্দে রাজি হয়ে যায়। দোতলার ঘর দুখানি খালিই পড়েছিল, আমরা সে দুটি ঘরের কথা এক স্থানীয় দালালকে জানাই। তারা এই নীলম আর জয়িতাকে এ বাড়িতে নিয়ে আসে। আমাদের কথা বার্তা হয়। দুজনকেই ভাল পরিবারের মেয়ে বলে মনে হয়েছিল। দুজনেরই বাবা মা আসেন এই বাড়িতে একদিন পরে...”

উপমন্যু বললেন “এই নীলম মেয়েটি কোথাকার?”

সুশান্তবাবু বললেন “কুচবিহারের। জয়িতার থেকে বড়। স্কুল শিক্ষিকা”।

উপমন্যু বললেন “আচ্ছা দুজনেই উত্তরবঙ্গ তবে। জয়িতার সঙ্গে নীলমের বন্ধুত্ব কেমন?”

সুশান্তবাবু বললেন “সেরকম দেখি না। দুজনেই সারাক্ষণ মোবাইল দেখে যাচ্ছে। এমনকি খেতে বসেও সেই মোবাইল। আজকাল তো জানেনই মোবাইলের দৌরাত্ম্য”।

উপমন্যু ইন্সপেক্টর রায়ের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। প্রত্যুত্তরে ইন্সপেক্টর রায়ও হাসলেন।

সুশান্তবাবু বললেন “আমি মাঝে মাঝে একটু আধটু বকেছি দুজনকেই। বুঝতেই পারেন, বয়সের অ্যাডভান্টেজ নিয়েছি আর কী। তখন দুজনেই শুনত অবশ্য। পরে আবার শুরু করে দিত”।

উপমন্যু বললেন “ও কিছু করার নেই সুশান্তবাবু। আমার মেয়েও একই কেস। কত আর বকব। যাক গে, আপনি জয়িতার কথা বলুন”।

সুশান্তবাবু বললেন “জয়িতা শিলিগুড়ির মেয়ে। ওর বাবা ব্যবসায়ী। মা গৃহবধূ। বাবা মায়ের খুব আদরের মেয়ে”।

উপমন্যু ইন্সপেক্টর রায়ের দিকে তাকালেন “এঁরা দুজন এসে গেছেন?”

রায় বললেন “হ্যাঁ। কাল এসেছেন। ওদের এক আত্মীয়ের বাড়ি আছে কেষ্টপুরে। সেখানে উঠেছেন”।

উপমন্যু বললেন “এ বাড়িতে আসেন নি তারা?”

সুশান্তবাবু বললেন “ফোন করেছিলেন সকালে জয়িতার বাবা। খুব ভেঙে পড়েছেন ভদ্রলোক। নিজেই বললেন এখন আর যাব না আপনার ওখানে। গেলেই মেয়ের কথা মনে পড়ে যাবে”।

ঘরে একটা নিস্তব্ধতা তৈরী হল কয়েক মুহূর্তের জন্য।

উপমন্যু ইন্সপেক্টর রায়কে বললেন “কী দুর্ভাগ্যজনক আমাদের চাকরি বলুন। একজন মেয়ের বাবা হয়ে আরেকজন বাবার কথা শুনতে হচ্ছে এভাবে। যাই হোক। সুশান্তবাবু, আপনি বলুন। এ বাড়িতে জয়িতার সঙ্গে দেখা করতে কে কে আসত?”

সুশান্তবাবু বললেন “কেউ আসত না। জয়িতা সকাল দশটায় বেরোত। অনেক রাত করে বাড়ি ফিরত”।

উপমন্যু বললেন “গেট খুলে দিত কে? অত রাতে কে জেগে থাকত?”

সুশান্তবাবু বললেন “আমার বউমা। জয়িতা এই বছরেই চাকরিটা পেয়েছে। আমার বউমা খুশি হয়েছিল খুব। বলেছিল মেয়েদের নিজের পায়ে দাঁড়ানোটা ও খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করে। যত রাতই হোক, বউমা দরজা খুলে দিত”।

উপমন্যু বললেন “জয়িতা কোথায় চাকরি করত?”

সুশান্তবাবু বললেন “একটা কলসেন্টারে। কলেজ থেকে বেরিয়ে ছ সাত ঘন্টা কাজ করত। বেশ হেকটিক জব”।

উপমন্যু গম্ভীর হয়ে রায়ের দিকে তাকিয়ে বললেন “কর্মক্ষেত্রে যোগাযোগ করা হয়েছে?”

রায় বললেন “হ্যাঁ। ভেরিফাই করা হয়েছে”।

উপমন্যু বললেন “ওখানে যাব এখান থেকে বেরিয়ে”।

রায় মাথা নাড়লেন “আচ্ছা”।

উপমন্যু সুশান্তবাবুর দিকে তাকালেন “আমি জয়িতার রুমটা দেখতে চাই। সম্ভব?”

সুশান্তবাবু বললেন “তালা দেওয়া আছে যে ঘরটা”।

উপমন্যু ইন্সপেক্টর রায়ের দিকে তাকালেন। রায় সুশান্তবাবুকে বললেন "তালা ভাঙলে আপনার কোন আপত্তি আছে সুশান্তবাবু?"
সুশান্তবাবু হাসলেন "নাহ। তবে দেখবেন দরজার কোন ক্ষতি হয় না যেন। মাস্টার কী না কী যেন বলে, চোরেরা যা দিয়ে দরজা খোলে, সেসব দিয়ে দরজা খোলা যায় না?"
রায় বললেন "ভাঙা ছাড়া গতি নেই। আমার কাছে এই মুহূর্তে সে জিনিস নেই"।
উপমন্যু ইন্সপেক্টর রায়কে বললেন "গালা আছে তো?"
রায় বললেন "হ্যাঁ"।
উপমন্যু সুশান্তবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন "ঘরটা আপাতত কিছুদিনের জন্য সীল করা থাকবে"।
সুশান্তবাবু ম্লান হাসলেন "বেশিদিন যাতে না হয় একটু দেখবেন অনুগ্রহ করে। বুঝতেই পারছেন, খুনটা তো এ বাড়িতে হয় নি। আর নীলম উপরের ঘরে একা থাকে"।
কলিং বেল বেজে উঠল। সুশান্তবাবু উঠে বললেন "ওই বুঝি নীলম এল"।
।।পর্ব ১- একুশ বছর বোধ হয়।।
৩।
নীলমের বয়স চব্বিশ পঁচিশের মধ্যে। তাদের দেখে খানিকটা থমকাল।
উপমন্যু বললেন "তুমিই নীলম, তাই তো?"
নীলম মাথা নেড়ে বলল "হ্যাঁ"।
উপমন্যু বললেন "বোস। ঘাবড়ে যেও না, আমরা বাঘ ভল্লুক নই"।
নীলম বসল একটা চেয়ারে।
সুশান্তবাবু ঘরে ঢুকলেন। নীলমকে বললেন "ওঁরা একটু কথা বলবেন এখন তোমার সঙ্গে। তুমি কি ফ্রেশ হয়ে আসবে না আগে কথা বলে নেবে?"
নীলম ফ্যাকাশে হাসল "না, কথা বলে নি। নো প্রবলেম"।
উপমন্যু বললেন "তোমার সঙ্গে জয়িতার বন্ধুত্ব ছিল?"
নীলম বলল "খুব বেশি ছিল না। আমি স্কুল থেকে ফিরে নিজের ঘরে চলে যেতাম। ওর এমনিতেই ফিরতে অনেক রাত হত। তবে কোন কোন রবিবার সিনেমা দেখতে যেতাম। টুকটাক আড্ডা হত"।
উপমন্যু নিজের মোবাইল বের করলেন, "আমি রেকর্ড করতে পারি তোমার বয়ান?"
নীলম বলল "সিওর স্যার"।
উপমন্যু মোবাইলের রেকর্ডার অন করে বললেন "দেখো নীলম, আমি তোমাকে এখন যে প্রশ্ন করব তুমি চাইলে সব প্রশ্নের উত্তর নাও দিতে পারো, কিংবা যদি মনে কর ল ইয়ার কন্সাল্ট করবে করতে পারো। তুমি স্বেচ্ছায় উত্তর দিতে চাইছ তো?"
নীলম বলল "হ্যাঁ স্যার। আপনি যা জানতে চাইছেন জয়িতার ব্যাপারে আমি বলতে প্রস্তুত"।
উপমন্যু খুশি হলেন "ফাইন। আমি শুধু জয়িতা সম্পর্কে কয়েকটা প্রয়োজনীয় তথ্য তোমার থেকে জানব। জয়িতা খুন হয়েছে সেটা তুমি কখন জানলে?"
নীলম বলল "পরশু মাঝরাতে। জয়িতার ফিরতে রোজই একটু রাত হয়। আমি ঘুমিয়ে পড়ি। পরশু আমি টায়ার্ড ছিলাম বেশ। খাতা দেখা ছিল অনেকগুলো। সাড়ে দশটা নাগাদ ঘুমিয়ে পড়ি। হঠাৎ মাঝরাতে আমার দরজায় বিশ্বজিত আঙ্কেল নক করেন। আমি একটু অবাকই হই কারণ অত রাতে কোন দিন আমাকে ডাকেন নি আঙ্কেল। উঠে দরজা খুলে জানতে পারি..."
উপমন্যু সুশান্তবাবুর দিকে তাকালেন "আপনিও কি সেদিনই জানতে পারি?"
সুশান্তবাবু ক্লান্ত মুখে মাথা নাড়লেন "না, আমাকে রাতে ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমোতে হয়। আমি পরের দিন ঘুম থেকে উঠে জানতে পারি"।

উপমন্যু রায়ের দিকে তাকালেন "ডেথ টাইমটা জানিয়েছে রিপোর্ট?"
রায় বললেন "গত পরশু, মানে ফিফথ নভেম্বর, সন্ধ্যে সাতটা"।
উপমন্যু বললেন "তার মানে পরশু মেয়েটা কলেজ থেকে কল সেন্টারে যায় নি। নীলম, জয়িতার কোন বয়ফ্রেন্ড, প্রেমিক, ছেলেবন্ধুর কথা জানো?"
নীলম একটু ইতস্তত করে বলল "আছে, মানে কয়েকজন..."
উপমন্যু অবাক হয়ে বললেন "কয়েকজন মানে?"
নীলম সুশান্তবাবুর দিকে তাকাল খানিকটা সংকুচিত হয়ে। সুশান্তবাবু উঠলেন "আমি অন্য ঘরে যাই"।
উপমন্যু হাসলেন "সাচ আ নাইস জেন্টলম্যান ইউ আর স্যার। থ্যাঙ্ক ইউ"।
সুশান্তবাবুও প্রত্যুত্তরে হাসলেন "মধুবালার সময়ের মানুষ কিনা, জেনারেশন গ্যাপ নিতে পারি না ঠিক"।
উপমন্যু হেসে বললেন "আমার চাকরি। কী করব বলুন। শুনতেই হবে"।
সুশান্তবাবু পাশের ঘরে গেলে উপমন্যু নীলমের দিকে তাকিয়ে বললেন "কয়েকজন মানে বিশেষবন্ধু কয়েকজন বলতে চাইছ?"
নীলম মাটির দিকে তাকিয়ে বলল "অ্যাকচুয়ালি রবিবারগুলো জয়িতার সঙ্গে সিনেমা দেখতে গেলে আমি খানিকটা অবাকই হয়ে যেতাম। মাঝে মাঝেই ওর ছেলেবন্ধুর মুখ গুলো আলাদা হয়ে যেত। ওরা আলাদা বসত আমি আলাদা"।
উপমন্যু অবাক হয়ে বললেন "তাহলে তোমাকে নিয়ে যাওয়ার কারণ কী? ও তো একাই যেতে পারত"!
নীলম বলল "আমিও জিজ্ঞেস করেছিলাম ওকে একই কথা। জয়িতা জানিয়েছিল ও নাকি একা যেতে ভয় পায়। এদিকে সিনেমা শেষে দেখতাম প্রায় প্রতিদিনই..."
নীলম চুপ করে গেল।
উপমন্যু ইন্সপেক্টর রায়ের দিকে তাকালেন "আমার মনে হয় মালবিকাম্যামকেও এই কেসে ইনভল্ভ করা প্রয়োজন। সবাই আমাদের সামনে সহজ নাও হতে পারে"।
রায় বললেন "কাল আসবেন আবার?"
উপমন্যু নীলমের দিকে তাকিয়ে বললেন "দেখ মা, আমার মেয়ে তোমার থেকে খানিকটা ছোট হবে। তবে আমার মনে হয় তুমি আমার সামনে ঠিক কমফরটেবল হতে পারছ না। কোন অসুবিধা হলে আমাদের লেডি অফিসার আছেন। তার সামনে ইন্টারোগেশন করলে সুবিধা হয় তোমার?"
নীলম বলল "না স্যার। আমি বলতে পারব। ইটস ওকে"।
উপমন্যু বললেন "ফাইন। তোমার কথা শুনে যা বুঝলাম জয়িতার সিনেমা দেখার একাধিক বন্ধু ছিল। ঠিক আছে। অন্য কথায় আসি। সাম্প্রতিক সময়ে জয়িতা কোন ব্যাপারে খুব টেন্সড ছিল বা কারো সঙ্গে ওর কোন ঝগড়া হয়েছিল কিনা বলতে পারবে?"
নীলম বলল "না, অতটা খেয়াল করি নি স্যার। তবে জয়িতা কাজের ব্যাপারে বেশ সিরিয়াস ছিল। অফিসে খুব কম কামাই করত"।
উপমন্যু বললেন "এ বাড়িতে কখনও কোন ছেলেকে নিয়ে এসেছে?"
নীলম বলল "না স্যার"।
উপমন্যু চোখ বন্ধ করে কয়েক সেকেন্ড ভেবে নিয়ে বললেন "জয়িতার বাবা মার সঙ্গে তোমার কেমন সম্পর্ক ছিল?"
নীলম বলত "তেমন কিছু না। ওরা এলে কথা বলতাম এই যা"।
উপমন্যু বললেন "তোমাদের দুজনের জীবন খানিকটা সমান্তরাল আবার খানিকটা না। তাই না নীলম? সমান্তরাল এই সেন্সে যে মুখোমুখি দুটো ঘরে তোমরা থাকতে অথচ দুজনের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ খুব কম হত। আবার রবিবারগুলো দুটো রেখার মিল হত। তবুও হত না"।

নীলম বলল “খানিকটা সেরকমই”।
উপমন্যু বললেন “এই বাড়ির সবার সঙ্গে জয়িতার বা তোমার সম্পর্ক কেমন?”
নীলম বলল “খুবই ভাল। এঁরা কেউই আমাদের কোন ব্যাপারে নাক গলান নি কোন দিন। বরং তমালিকাআন্টি জয়িতাকে মানসিক সাপোর্ট দিতেন খুবই। জয়িতার খবরে আন্টি বেশ ভেঙে পড়েছেন। আজ খানিকটা জোর করেই ওকে অফিস নিয়ে গেছেন আঙ্কেল। ছেলে মেয়ে নেই তো। খানিকটা ইমোশনাল অ্যাটাচমেন্ট তৈরি হয়ে গেছিল আর কী...”
উপমন্যু বললেন “হু। কখন আসবেন ওরা?”
উপমন্যুর কথাটা শেষ হল না কলিং বেল বেজে উঠল।
উপমন্যু হাসলেন “সাচ আ কোইন্সিডেন্স। দেখো তো। মনে হয় বিশ্বজিৎবাবু এবং তমালিকাদেবী এসে পড়েছেন”।

।।পূর্ব কথা- অলির কথা শুনে বকুল হাসে।।
মহাষষ্ঠী ছিল সেদিন।
তমালিকা বোনের বাড়ি গেছিল। নীলম বাড়ি। বাবা শুয়ে পড়েছিল একটু আগেই।
রাত আটটা নাগাদ যখন জয়িতা এল বিশ্বজিৎই দরজা খুলেছিলেন।
তাকে দেখে জয়িতা হাসল।
বিশ্বজিৎ দরজা বন্ধ করে ঘরে গিয়ে বসেছিলেন।
কিছুক্ষণ পরে দোতলা থেকে একটা আওয়াজ।
বিশ্বজিৎ তড়িঘড়ি দোতলা গিয়ে দেখলেন জয়িতা আরশোলার ভয়ে খাটে উঠে দাঁড়িয়ে আছে।
তাকে দেখে বলল “আঙ্কেল প্লিজ, এটাকে তাড়ান”।
বিশ্বজিৎ এদিক সেদিক তাকিয়ে একটা ঝাঁটা দেখতে পেলেন। আরশোলাটাকে ঝাটা দিয়ে সরাতে গিয়ে সেটা জয়িতার গায়েই গিয়ে পড়ল।
জয়িতা আর্তনাদ করে তাকে জড়িয়ে ধরল।
তাকে জাপটে থাকা জয়িতার শরীর, নিঃশ্বাস... সব কিছু তাকে উত্তেজিত করে তুলছিল। আরশোলাটাকে অবশ্য জব্দ করতে বেশিক্ষণ লাগল না।
জয়িতা তাকে ছেড়ে দিয়ে বলল “সরি”।
বিশ্বজিৎ নিচে নেমে এলেন।
গায়ে জয়িতার গন্ধ মেখে।
মেয়েটা অদ্ভুত একটা পারফিউম ব্যবহার করে। তার জামায় লেগে গেছে সেটা। জামায় লেগে গেছে জয়িতার হাইলাইট করা একটা চুলও।
বিশ্বজিতের দম বন্ধ হয়ে আসছিল। তমালিকা তাকে বঞ্চিত করে রেখেছেন সারাজীবন। এক অদ্ভুত ফ্রিজিডনেস আছে তার। কিছুতেই ইচ্ছা করে না।
বলেছেন অবশ্য কয়েকবার “তোমরা ইচ্ছা করলে তুমি কাউকে জুটিয়ে একটা কিছু করতে পারো। আমি বাঁধা দেব না”।
বিশ্বজিৎ হেসে উড়িয়ে দিয়েছেন বরাবর “ধুস! কী যে বল। মুখে যা আসে বলে দিলেই হল নাকি?”
তমালিকাও হেসেছেন। ঠাট্টা করে বলেছে “নাহ, এমনি এমনি বলছি না। যেটা তোমার বউ দিতে পারে না, অন্য কেউ দিলে ক্ষতি কী?”
বিশ্বজিৎ বলেছেন “দরকার নেই বলেছি তো। আমার কিছু হলে কি তুমি রাস্তা ঘাটে শুয়ে বেড়াতে নাকি”!

শুনে মনে মনে খুশি হলেও তমালিকা মুখে রাগ দেখিয়ে বলেছেন “ঈশ, কী সব কথা! যত উল্টোপালটা কথা বলতে শিখেছে লোকটা। বাবাকে বলতে হবে”।

বিশ্বজিতের বারে বারেই মনে হয়েছে বাড়িতে তো কেউ নেই আর, দোতলায় গেলেই তো হল। মেয়েটা যদি রাজি হয়ে যায়! পরক্ষণেই মনে হয়েছে, এসব কী ভাবছেন তিনি! এতো ধর্ষণেচ্ছা জাগল কীভাবে কখন? ভাবলেন কী করে এমন কথা? একই বাড়িতে থাকে সবাই। যদি তমালিকা বুঝে যায়? তমালিকা যদি সন্তান নিতে পারত, তাহলে তাদের মেয়ের বয়স তো জয়িতার কাছাকাছিই হত! মাথায় আসল কী করে এসব কথা? নাকি অফিস বাড়ি আর বাড়ি অফিস করে করে মাথার ভেতরে কোথাও একটা লুকিয়ে ছিল সবকিছু! সময় করে বেরিয়ে এসেছে! এত ভয়ংকর হয় অবচেতন? নিজের মধ্যে অদ্ভুত টানাপোড়েনে রাতে আর ঘুমাতে পারেন নি বিশ্বজিৎ। ঘুম এসেছিল শেষ রাতের দিকে।

সকালে উঠে মায়া মাসী এসে ঘুম ভাঙিয়ে জানাল বাজার আনতে হবে।

বিশ্বজিৎ বাজার সেরে এসে দেখলেন বাবা বাইরের ঘরে বসে আছেন।

তাকে দেখে বললেন “বউমা কবে আসবে যেন?”

বিশ্বজিৎ বাবার সামনের চেয়ারে বসে বললেন “নবমীর দিন”।

সুশান্ত বললেন “তুইও গিয়ে থেকে আসতে পারতিস তো”!

বিশ্বজিৎ বললেন “থাক না। এতদিন পর দুই বোন একসঙ্গে ঘুরবে। আমি গিয়ে খামোখা কী করব”?

সুশান্ত হাসলেন “তা ঠিক। এবারে একটা ভাল জিনিস দেখেছিস? পাড়ার পুজোর মাইক কিন্তু খুব বেশি জ্বালাচ্ছে না”।

বিশ্বজিৎ বললেন “রাত হলে দেখো কী করে। এদের কোন ভরসা নেই তো”।

সুশান্ত বললেন “তা ঠিক। এবার পুজোর চাঁদা নিয়ে গেছে?”

বিশ্বজিৎ বললেন “হ্যাঁ। নিয়ে যাবে না? ছাড়বে নাকি?”

ব্রেকফাস্ট খেতে নেমে এসেছিল জয়িতা। বিশ্বজিৎ খানিকটা কুঁকড়ে গেলেন জয়িতাকে দেখে। নিজের প্রতি ঘেন্না হল হঠাৎ করে।

জয়িতা ডাইনিং রুমে বসে বলল “উফ আংকেল, কাল আপনি না থাকলে যে কী হত”!

সুশান্ত অবাক চোখে জয়িতার দিকে তাকিয়ে বললেন “কেন? কী হয়েছিল কালকে?”

জয়িতা বলল “আর বোল না দাদু, কাল একটা আরশোলা ঢুকে পড়েছিল আমার ঘরে। আমি তো ভাবলাম গেল সব বোধ হয়। আংকেল ছিল বলে বেঁচে গেলাম”।

সুশান্ত হো হো করে হেসে উঠলেন। বিশ্বজিৎ হাসলেন। হাসতে গিয়ে নিজের অজান্তেই বুঝতে পারলেন জয়িতার শরীরটা আবার টানছে তাকে।

নিজের অজান্তেই সিঁটিয়ে গেলেন মনে মনে।

।।পূর্ব কথা- অলির কথা শুনে বকুল হাসে।।

২।

গড়পঞ্চকোটে সন্ধ্যে নামে তাড়াতাড়ি। বন বাংলোয় যারা আসে তাদের ব্যস্ততা থাকে না। এসে খেয়ে দেয়ে ঘরে ঢুকে কেউ বসে বোতল খুলে, কেউ বা বন্ধুদের সঙ্গে এলে তাস নিয়ে বসে।

দুটো ঘর বুক করেছিল অনীশ আর রোহিত। আসানসোল পেরোতেই ভয়টা জাঁকিয়ে বসেছিল নীলমের, যদি বাংলোয় আনম্যারেড কাপল অ্যালাউ না করে সেক্ষেত্রে কী হবে।

বাস্তবে দেখা গেল সেসব কোন সমস্যাই হল না। মসৃণ চেক ইন হয়ে গেল। একটা বাংলোর নীচের তলায় জয়িতা - অনীশ, ওপরের তলায় নীলম আর রোহিত।

অন্ধকার ঘিরে ধরেছে চারপাশ থেকে, নীলমকে যেভাবে জড়িয়ে ধরেছিল রোহিত ঘরে ঢোকার পরেই। নীলম বাঁধা দিতে পারে নি। একটা সম্পূর্ণ অপরিচিত শরীর চেনার নেশার মধ্যে রোহিতে ডুবে যেতে যেতে সে সব চিন্তা বিসর্জন দিয়েছিল।

বাড়িতে বলেছে স্কুল থেকে পুরুলিয়া নিয়ে যাচ্ছে। পিজিতেও তাই। জয়িতা অবশ্য বাড়ি যাবার নাম করে এসেছে।

জয়িতার বাড়ি থেকে পিজিতে ফোন করে না। জয়িতাকেই ফোন করে।

রোহিত তার অনাবৃত শরীরে চুমু খেতে খেতে বলেছিল "ইউ আর বিউটিফুল নীলম"।

নীলম অন্যকিছু ভাবতে পারে নি। ভালবাসায় ভেসে যাওয়া ছাড়া অন্য কিছু ভাবা সম্ভবও ছিল না।

প্রথমবারের পরে অবশ্য একটু অপরাধবোধ গ্রাস করল তাকে। বাবা মার মুখটা মনে পড়ে গেছিল। মনে হয়েছিল তার বিয়ের জন্য কত উত্তেজিত তার বাবা মা, যদি জানতে পারেন সে এই কাজটা করেছে তখন কি তাকে ক্ষমা করে দিতে পারবে? পরক্ষণেই রোহিত তাকে ভুলিয়ে দিয়েছে সব কিছু। নরম বিছানায়, আবছা অন্ধকারে রোহিতের পৌরুষ আর কিছু মনে পড়তেই দিচ্ছিল না।

বৃষ্টি নেমেছে অসময়ের, জানলা থেকে জলের ছিটে আসছে তাদের শরীরে।

রোহিত তাকে জড়িয়ে ধরে শুয়েছিল। অস্ফূটে বলল "ইট ওয়াজ অসাম"।

নীলম বলল "কথা বোল না। ভাল লাগছে না কিছু শুনতে"।

রোহিত বলল "তোমার বাবা মা অবাঙালি জামাই মানবেন তো?"

নীলম রোহিতের গালে একটা টোকা মেরে বলল "বিয়েটা বাবা মার সঙ্গে করবে বুঝি তুমি? এসব কথা এখন ভাবার দরকারই বা কী?"

রোহিত বলল "জানো তো, এখন আমার টপ অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ফিল হচ্ছে। মনে হচ্ছে তোমাকে নিয়ে আরও দূরে কোথাও চলে যাই। আচ্ছা, তোমার বন্ধুটাকে আনার কি খুব দরকার ছিল?"

নীলম বলল "কী করব? এরকম এক্সপেরিয়েন্স তো আগে হয় নি। ওর এক্সপেরিয়েন্স আছে। ওই জন্যই তো ওকে আনা"।

রোহিত অবাক হয়ে বলল "মানে? ওই অনীশকে নিয়ে?"

নীলম হেসে বলল "ধুস।শুধু অনীশ? ওরকম কত অনীশ আছে!"

রোহিত বলল "রিয়েলি? ওর যদি এইডস হয়?"

নীলম বলল "হলে হবে। আমার কী?"

রোহিত বলল "না না সিরিয়াসলি। দেখো, ভুলেও ওর সঙ্গে লেসবিয়ান কিছু করতে চেও না"।

নীলম খাটে উঠে রোহিতের দিকে বড় বড় চোখ করে বলল "কী বললে তুমি? আরেকবার বল"।

রোহিত হো হো করে হেসে ফেলল। নীলম রোহিতের পেটে একটা ঘুষি মেরে বলল "অসভ্য কোথাকার! সারাক্ষণ শুধু সব রিলেশনে সেক্স ছাড়া কিছু ভাবতে পারো না, না?"

রোহিত বলল "সেটা কখন বললাম? শুধু বলছি, ওই দুটো মেয়ে পাশাপাশি ঘরে থাকো, না মানে হতেই তো পারে, কোন কোন দিন এরকম রোম্যান্টিক ওয়েদারে দুজনেরই ক্যান্ডেল ইউজ করার ইচ্ছে হল। সেলফ হেল্প আর কী!"

নীলম রোহিতের পেটে জোরে একটা চিমটি কাটল। রোহিত "মর গয়া, ছোড় দো, ফির নেহী বলুঙ্গা" বলে অনুনয় করতে থাকল।

নীলম বলল "শুধু যত ফালতু কথা। একদম ভাল লাগে না আমার এসব। আর যদি বলেছ, তাহলে তোমার খবর আছে"।

রোহিত প্রত্যুত্তরে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল এমন সময় তাদের ঘরের কলিং বেল বেজে উঠল। নীলম অবাক হয়ে একটু জোরে বলল 'কে?"

বাইরে থেকে জয়িতার গলা ভেসে এল "আমি। একটু খোল। কথা আছে"।
নীলম অবাক হল। জয়িতার গলাটা গম্ভীর লাগছে। তাছাড়া এই বৃষ্টিতে কি মেয়েটা ভিজে এল নাকি দোতলায়? সিঁড়ি তো বাইরে থেকে আছে।
রোহিতকে টিশার্ট আর শর্টস পরে নিয়ে বলে, দ্রুত হাতে নাইটি পরে দরজা খুলল নীলম। দেখল জয়িতা গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে আছে। দরজা খুলতেই জয়িতা ঘরে ঢুকে খাটের ওপর বসে পড়ল।
রোহিত অবাক গলায় বলল "কী হয়েছে?"
জয়িতা ভাঙ্গা গলায় বলল "আমি এখানে থাকব না। এখনই কলকাতা ফিরে যাব"।
দুজনে অবাক হয়ে জয়িতার দিকে তাকিয়ে রইল।
।।পর্ব ১- একুশ বছর বোধ হয়।।
৪ ।
বিশ্বজিৎ এবং তমালিকা ঘরে ঢুকে উপমন্যু এবং ইন্সপেক্টর রায়কে দেখে অবাক হলেন। উপমন্যু বললেন "আপনি নিশ্চয়ই বিশ্বজিৎবাবু, এবং আপনি তমালিকা দেবী?"
তমালিকা বললেন "হ্যাঁ। ঠিকই ধরেছেন"।
উপমন্যু বললেন "জানি আপনারা দুজনেই ক্লান্ত, তবু যদি একটু বসতেন ভাল হত"।
বিশ্বজিৎ একটা চেয়ার টেনে বসলেন "নিশ্চয়ই"।
তমালিকা বললেন "আপনাদের কিছু দেওয়া হয় নি দেখছি। চা বা কফি কিছু দেব?"
উপমন্যু খুশি হয়ে বললেন "তাহলে তো খুবই ভাল হয়। কিন্তু আপনার কষ্ট হবে না?"
তমালিকা হাসলেন "না না। কী যে বলেন। সত্যি কথা বলতে কী জয়িতাকে আমি নিজের মেয়ের মত দেখতাম। গোটা ব্যাপারটা আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না স্যার। যদি দোষী ধরা পড়ে, আমার থেকে খুশি কেউ হবে না"।
উপমন্যু বললেন "অনেক ধন্যবাদ আপনাকে তমালিকাদেবী। আমাদের চাকরিতে তো এরকম আপ্যায়ন সহজে জোটে না, সবাই মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিতে পারলেই খুশি হন। আপনি যে আমাদের কথাটা ভেবেছেন, তাতেই আমি ভীষণ খুশি। আমি চিনি ছাড়া চা খাব। রায় চিনি দিয়েই খাবে"।
রায় বললেন "আমাকেও এক চামচের বেশি দেবেন না"।
তমালিকা নীলমের দিকে তাকালেন "তুমি খাবে?"
নীলম ঘাড় নাড়ল "হ্যাঁ আন্টি"।
তমালিকা রান্নাঘরে রওনা হলেন।
উপমন্যু বিশ্বজিৎকে বললেন "একদিকে ভালই আপনাদের বলুন? স্বামী স্ত্রী একই অফিসে চাকরি করেন। আমার মিসেস অবশ্য কলেজে পড়ান। দুজনের শিডিউলও আলাদা। মেয়েটার দিকে সময় দেওয়া হয় না তেমন"।
বিশ্বজিৎ বললেন "ওই আর কী। একই অফিস হলেও কাজের ক্ষেত্রে আমাদের মুখোমুখি হতে হয় না"।
উপমন্যু বিশ্বজিতের দিকে তাকিয়ে বললেন "আপনার দাদার সঙ্গে বোধ হয় খুব বেশি যোগাযোগ নেই মিস্টার হালদার, তাই না?"
বিশ্বজিৎ উপমন্যুর দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে বললেন "বাবা বলেছেন বুঝি দাদার কথা?"
উপমন্যু বললেন "হ্যাঁ। তাছাড়া আর কোথা থেকে জানব?"
বিশ্বজিৎ বললেন "আসলে দাদাই তেমন যোগাযোগ রাখে না আর কী। ফোন করলে সেভাবে রেস্পন্সিভও না"।
উপমন্যু বললেন "এতটা বিকর্ষণ কেন?"
বিশ্বজিৎ মাথা নাড়লেন, "বলতে পারব না"।

উপমন্যু বললেন "ভদ্রলোকের ফোন নাম্বার দিতে পারবেন?"
বিশ্বজিৎ অবাক হয়ে বললেন "পারব, কিন্তু এই কেসের সঙ্গে কি সেটার কোন সম্পর্ক আছে?"
উপমন্যু বললেন "দিয়ে রাখবেন। কখন কী প্রয়োজন পড়ে কে জানে বলুন। গুরুদেব তো বলেইছেন ছাই উড়িয়ে দেখতে। অমূল্যরতন যদি পাওয়া যায়"।
নীলম একটু উশখুশ করছিল, উপমন্যু নীলমের দিকে তাকিয়ে বললেন "তুমি কি ফ্রেশ হবে? যেতে পারো, অসুবিধে নেই"।
নীলম বলল "আমি রান্নাঘরে যেতে পারি?"
উপমন্যু বললেন "নিশ্চয়ই। কেন পারবে না? যাও"।
নীলম থ্যাঙ্ক ইউ বলে রান্নাঘরে গেল।
উপমন্যু বিশ্বজিতের দিকে তাকিয়ে বললেন "জয়িতা সম্পর্কে আপনার ওপিনিয়ন কী বিশ্বজিৎবাবু?"
বিশ্বজিৎ একটু ভেবে বললেন "দেখুন, আমরা তো এই সময়ে অফিস থেকে ফিরি। সকালে সাড়ে আটটা পৌনে ন'টার মধ্যে আমাদের বেরিয়ে যেতে হয়। এবারে নীলম বা জয়িতা কারো সঙ্গেই সেভাবে কথা হত না আমার খাবার সময় ছাড়া। পরে তো জয়িতা চাকরি পেয়ে গেল। আমার সঙ্গে কথাই হত না বলতে পারেন। তবে তমালিকা ওকে খুব স্নেহ করে। ওদের দুজনের মধ্যে একটা বন্ডিং ছিল"।
উপমন্যু বললেন "খুনের দিন আপনি কোথায় ছিলেন বিশ্বজিৎবাবু?"
বিশ্বজিৎ বললেন "বাড়িতেই ছিলাম। যেরকম অফিস থেকে এখন এলাম, সেরকমই। দুজনে এসেছিলাম এক সঙ্গে"।
উপমন্যু বললেন "আপনার কাউকে সন্দেহ হয় এই ব্যাপারে?"
বিশ্বজিৎ হাসলেন "আমার সঙ্গে জয়িতার সেভাবে দেখাই হত না স্যার। ও কাদের সঙ্গে মিশত, কোথায় যেত, কী করত, সে সম্পর্কে আমার কোন ধারণাই ছিল না। এ বাড়িতেও কোন দিন কোন বন্ধু বা বান্ধবীকে নিয়ে এসে হাজির হয় নি যাতে আমি বা বাবা এমব্যারাস হই। সন্দেহ করার প্রশ্নই আসে না আর কী"।
উপমন্যু বললেন "তা ঠিক। আচ্ছা আপনাকে আরেকটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করতে পারি? আপনি ইচ্ছা না হলে জবাব দেবেন না"।
বিশ্বজিৎ বললেন "হ্যাঁ বলুন"।
উপমন্যু একটু থমকে বললেন "আপনারা যে নিঃসন্তান, এর জন্য কে দায়ী? আপনি না মিসেস হালদার?"
বিশ্বজিৎ গম্ভীর হলেন, চুপ করে নিয়ে বললেন "প্রশ্নটা একটু বেশিই ব্যক্তিগত হয়ে গেল না অফিসার?"
উপমন্যু হাত তুললেন "হ্যাঁ, সেটা আমিও জানি। আপনি না চাইলে উত্তর দেবেন না। কোন সমস্যা নেই"।
বিশ্বজিৎ গম্ভীর মুখেই বললেন "সমস্যাটা ওর। কিন্তু দয়া করে ওকে এ নিয়ে কোন প্রশ্ন করবেন না। এই ব্যাপারে ওর একটা ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স আছে। কোন ভাবে সে প্রশ্নটা উঠে গেলে ওকে সামলানো একটু কঠিন হয়ে যায়। অদ্ভুত ডিপ্রেশনে চলে যায়। আপনি প্লিজ..."
উপমন্যু বললেন "নিশ্চয়ই। আমি কথাটা মাথায় রাখব। সরি মিস্টার হালদার। মাঝে তদন্তের স্বার্থে এমন সব প্রশ্ন বেরিয়ে আসে। তার মানে আপনি যৌনতায় সক্ষম তাই তো?"
বিশ্বজিৎ এবারে রাগী চোখে উপমন্যুর দিকে তাকালেন।

।।পূর্বকথা - নিশিপদ্ম।।
"রেস্তোরাঁয় খেলে টিপস কত দিতে হয় জানিস?" অনীশ ফাইভ ফিফটি ফাইভ সিগারেটে একটা লম্বা টান মেরে রজতকে জিজ্ঞেস করল।

রজত চুপচাপ বসে ছিল ক্যান্টিনে। অনীশই কিছুক্ষণ আগে এসে তার পাশে বসেছে। জয়িতা যেই রজতের পাশে এসে বসেছে, সঙ্গে সঙ্গে অনীশ প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিয়েছে রজতকে।
রজত বলল "জানি না"।
অনীশ বলল "তুই কত দিস?"
রজত বলল "দশ টাকা। কখনও কখনও দিই না। কখনও কখনও খাই না"।
অনীশ জয়িতার দিকে তাকিয়েই রজতের দিকে চোখ ফেরাল, "জয়িতাকে নিয়েও যাস না?"
রজত একটু কুণ্ঠিত হয়ে বলল "জয়িতাকে নিয়ে খুব বেশি যাতায়াত হয় না তো। কোথাও গেলে আমরা দুজনেই শেয়ার করে নি"।
অনীশ বিদ্রুপাত্মক হাসি হেসে বলল "ওহ। তাই ভাবি। তুইই বা কোত্থেকে এত টাকা পাবি"।
মুখে চুক চুক শব্দ করল অনীশ।
রজত বলল "আমি কোথায় পাব না পাব তার থেকেও বেশি ইম্পরট্যান্ট আমি কোথায় খাব সেটা ঠিক করবে কে? তুই?"
অনীশ ভয় পাওয়ার মুখ করে বলল "ওহ, সরি সরি সরি। অনুভূতিতে লেগে গেছে। কিছু মনে করিস না ভাই। জয়িতা, তুইও কিছু মনে করিস না। রজত ছেলেটা কিন্তু ভাল। তবে পকেটে তেমন জিনিস নেই। এসব ছেলের সঙ্গে প্রেম করে কী লাভ বল?"
জয়িতা বলল "তুই জেনে কী করবি সেটা? তুই প্রেম করবি?"
অনীশ সিগারেটটা অ্যাসট্রেতে গুঁজে বলল "আমি তো রাজি। তুই রাজি হলেই হল"।
জয়িতা রজতের দিকে তাকিয়ে রাগী গলায় বলল "তুই এখানে এসব ভাট শোনার জন্য বসে আছিস কেন?"
রজত বলল "আমি এখানেই বসে ছিলাম। অনীশই পরে এল। নইলে আমাকেই বা কোন পাগলা কুকুরে কামড়েছে যে ওর মুখোমুখি হব?"
অনীশ হাসতে হাসতে বলল "ভাই, রেগে যাচ্ছিস কেন? আমাদের মধ্যে কি এই রিলেশন ছিল? আমি দেখেছি, আমার অনার্স কেটে যাবার পর থেকেই তুই আমাকে অ্যাভয়েড করছিস। কিন্তু মাইরি বলছি, বুকে হাত রেখে বল তো ভাই, এই বাজারে অনার্স করেই বা কী ছিড়বি তুই? আমার তো বাপের ব্যবসা আছে, এখনই লোকের চাকরি দেওয়ার ক্ষমতা রাখি। তুই চাইলে তোকেও রেখে দেব আমাদের অফিসের চা ওয়ালার চাকরিতে"।
বিশ্রী ভঙ্গিতে হাসতে লাগল অনীশ।
রজত উঠে পড়ল। জয়িতার দিকে তাকিয়ে বলল "আমি গেলাম। কাজ আছে। বিকেলে দেখা হচ্ছে"।
লম্বা লম্বা পা ফেলে রজত ক্যান্টিন থেকে বেরিয়ে গেল।
জয়িতা উঠতে যাচ্ছিল অনীশ বলল "এই শোন না। জাস্ট একটা কোয়ারি ছিল"।
জয়িতা রাগী গলায় বলল "আমি যাই। এখানে বেশিক্ষণ থাকব না"।
অনীশ বলল "কেন? রজত রেগে যাবে? চিন্তা নেই, আমাদের মধ্যে এরকম লেগ পুলিং চলে"।
জয়িতা থমথমে গলায় বলল "আমি তো এসবের সঙ্গে অভ্যস্ত নই। তাই আমার ভাল লাগে না। কী জানবি বলছিলি, বল"।
অনীশ বলল "তুই ইংলিশ মিডিয়াম তো? এইচ এস অবধি?"
জয়িতা বলল "হ্যাঁ। কেন?"
অনীশ বলল "এমনি, তেমন কিছু না। বাবার কলসেন্টারে ভ্যাকান্সি আছে। চাইলে একটা ইন্টারভিউর ব্যবস্থা করতে পারি। মাসে কুড়ি বাইশ হয়ে যেত"।
জয়িতা কয়েক সেকেন্ড অনীশের দিকে তাকিয়ে বলল "তুই আমাকে প্র্যাঙ্ক করছিস তাই তো?"
অনীশ বলল "প্র্যাঙ্ক কেন হবে? তুই আমাকে রিজিউমটা পাঠা, তারপর নিজেই দেখে নে কী হতে পারে"।

জয়িতা বলল “বাহ। এত দয়া কেন? এর বদলে আমাকে কী করতে হবে?”
অনীশ বলল “তুই রাজি হ, তারপর না হয় জানবি”।
জয়িতা বলল “আমি সিভি পাঠাতে পারি আজই”।
অনীশ জয়িতার দিকে তাকিয়ে হাসি হাসি মুখ করে বলল “আই কার্ড ক্যারি করিস?”
জয়িতা বলল “ভোটার কার্ড আছে”।
অনীশ বলল “হোটেলে চেক ইনে লাগতে পারে”।
জয়িতা কয়েক সেকেন্ড রাগী চোখে অনীশের দিকে তাকিয়ে বলল “আমি রজতকে এখনই বলছি”।
অনীশ বলল “সে বল, কিন্তু ওই মালটার সাথে ঝুললে এ জীবনে কিছু হবে না বলে দিলাম। কিপটের গাছ মালটা। গরীব না কিন্তু, কিপটে। ঘোর কদিন, বুঝে যাবি। আমার কী আছে, তোর ভালর জন্যই বলেছিলাম”।
অনীশ আরেকটা সিগারেট ধরাল।
জয়িতা কঠিন চোখে অনীশের দিকে তাকিয়ে রইল।

।।যেখানে দেখিবে ছাই।।
চা নিয়ে চলে এসেছিলেন তমালিকা।
উপমন্যু চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললেন “জয়িতা চা খেত?”
তমালিকা বললেন “হ্যাঁ। তবে নীলম যেমন দু বেলা খায় সেরকম না। ও সকালে খেত শুধু”।
উপমন্যু বললেন “আপনাদের বাড়িতে রান্না করেন যিনি তিনি কখন আসবেন?”
তমালিকা ঘড়ি দেখে বললেন “আরেকটু পরই”।
উপমন্যু বললেন “কত নেন?”
বিশ্বজিৎ বললেন “তিন হাজারটাকা”।
উপমন্যু বললেন “এদিকে তাও ঠিক আছে। আমাদের ওদিকে আরও বেশি নেয়। রায়, তোমাদের ওদিকে কত নেয় রান্না করলে?”
রায় বললেন “তিনই। কম বেশি এরকমই রেট বটে”।
উপমন্যু চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন “সুন্দর চা হয়েছে। নীলম কোথায় গেল? সুশান্তবাবু আসতে পারবেন? এলে ভাল হয়।”
তমালিকা নীলমকে ডাকলেন। নীলম পাশের ঘর থেকে এসে বসল। বিশ্বজিৎ সুশান্তবাবুকে নিয়ে এলেন। সবাই বসলে উপমন্যু বললেন “আমি একটু ব্রিফ করে দি। এই বাড়িতে পিজি হিসেবে থাকত জয়িতা। খুন হয়েছে। ধাপার মাঠে তার লাশ পাওয়া গেছে। জয়িতার বয়স একুশ। উচ্চতা পাঁচ ফুট আড়াই ইঞ্চি। জয়িতা সুন্দরী ছিল। তার গুণগ্রাহীর অভাব ছিল না। খুনটি অত্যন্ত প্রফেশনালি করা হয়েছে। ঘটনাস্থলে এখনও অবধি ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাওয়া যায় নি। জয়িতার ফোনটিও রিসেট করা হয়েছে, সেখানেও ফিঙ্গারপ্রিন্ট অত্যন্ত যত্ন করে মুছে দেওয়া হয়েছে। অবশ্য রিসেট করে বিশেষ লাভ করতে পারে নি। ফোনের ডাটা রিকভার করা হবে। সে সূত্র ধরে আমরা খানিকটা এগোতে পারি নাকি দেখব। আমি আপনাদের সবার কাছে একটা প্রশ্নই জিজ্ঞেস করব। আপনারা কাউকে সন্দেহ করেন? সুশান্তবাবু, আপনি বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষ, আপনাকে দিয়ে শুরু করা যাক”।
সুশান্তবাবু ক্লান্ত ভাবে মাথা নেড়ে বললেন “আমি কাকে সন্দেহ করি বলুন তো। আমি এখনও সেভাবে কিছু বুঝে উঠতে পারলাম না”।
উপমন্যু বললেন “ফাইন। বিশ্বজিৎবাবু”?
বিশ্বজিৎবাবু বললেন “নাহ। আমিও বাবার দলেই। অফিস করে এসে তারপরে আর কীই বা দেখব বলুন”।

উপমন্যু তমালিকার দিকে তাকিয়ে বললেন "আপনার সঙ্গে তো জয়িতার সখ্যতা ছিল শুনেছি, আপনি কাউকে?"
তমালিকা বললেন "ভেবে বলি?"
উপমন্যু পকেট থেকে তার কার্ড বের করে টেবিলে রাখলেন "যার যা মনে পড়বেন আমাকে ফোন করবেন। নীলম তুমি? তোমার কাউকে সন্দেহ?"
নীলম ফ্যাকাশে হাসল "আমি কী বলি আর..."
উপমন্যু বললেন "হু। আমি দু তিন দিন পরে এসে এই প্রশ্নটাই আবার সবাইকে করব। চলুন, আমি জয়িতার ঘর দেখতে যাব। বিশ্বজিৎবাবু আপনি আমাকে গাইড করুন প্লিজ। নীলম তুমিও চল"।
তমালিকা বললেন "আমি আসব?"
উপমন্যু বললেন "দরকার নেই। তবে আপনি চাইলে আসতে পারেন"।
তমালিকা উঠলেন "চলুন আমিও যাই"।
উপমন্যু বললেন "একটা হাতুড়ি দিতে পারবেন? তালা ভাংতে হবে তো"।
তমালিকা বললেন "নিচ্ছি"।
উপমন্যু ইন্সপেক্টর রায়কে নিয়ে দোতলায় উঠলেন। নীলম এবং বিশজ্জিৎবাবুও তাদের সঙ্গে উঠলেন। দোতলায় মাঝে একটা বড় কড়িডর। তার বা দিক ডানদিকে দুটো করে ঘর। উপমন্যু বললেন "চারটে ঘর তো। নীলম আর জয়িতার ঘর কোন দুটি?"
বিশ্বজিৎ আঙুল তুলে দেখালেন, "বাদিকেরটা নীলমের, ডানদিকেরটা জয়িতার... ছিল"।
উপমন্যু বললেন "বাকি দুটো ঘর? দাদার?"
বিশ্বজিৎ বললেন "ছিল। খালিই আছে"।
উপমন্যু বললেন "আচ্ছা। নীলম তুমি ঘরে যাও"।
নীলম ব্যাগ থেকে চাবি বের করে তার ঘর খুলল। খানিকক্ষণ পরেই তমালিকা হাতুড়ি নিয়ে এলেন।
উপমন্যু হেসে রায়ের দিকে তাকিয়ে বললেন "দয়া, দরওয়াজা তোড় দো"।
রায়ও প্রত্যুত্তরে হাসলেন। কমদামী তালা। ভাংতে বেশি বেগ পেতে হল না।
ঘর খুলে আলো জ্বেলে দেখা গেল মশারি করা। ঘরে যত্র তত্র জিনিস পড়ে আছে। বেশ অপরিচ্ছন্ন ঘর।
উপমন্যু মুখে শব্দ করে বললেন "এ যুগের ছেলেমেয়েগুলো না"!
তমালিকা বললেন "আমি প্রায়ই ওকে বলতাম চাবি দিয়ে যেতে, কিছুতেই যেত না। বলত অনেক সিক্রেট আছে নাকি"।
উপমন্যু বললেন "তাই নাকি? আচ্ছা, আপনারা এবার যেতে পারেন। আমরা একটু দেখি ঘরটা"।
বিশ্বজিৎ তমালিকা দুজনেই বেরিয়ে গেলেন।
উপমন্যু মশারি খুলে খাটের এক পাশে গুটিয়ে রাখলেন।
খাটের ওপরে একটা বই খোলা। "একজাম প্রিপারেশন"।
উপমন্যু চিন্তিত মুখে বইটার কয়েকটা পাতা উলটে টেবিলের ওপরে রাখলেন। ইন্সপেক্টর রায়কে বললেন "একটা ডাউট হচ্ছে রায়"।
ইন্সপেক্টর রায় বললেন "কী বলুন তো?"
উপমন্যু বললেন "ঘরের চাবি সত্যি এবাড়ির আর কারো কাছে নেই?"

।।যেখানে দেখিবে ছাই।।

এস আর জি ইনফোটেকের অফিসটা ছোট। তবে নিজস্ব বিল্ডিং।
গেটে গাড়ি দাঁড় করাল নিরাপত্তারক্ষীরা।

ইন্সপেক্টর রায় গাড়ি থেকে নেমে আই ডি কার্ড দেখালেন। বললেন “তদন্তের জন্য এসেছি। ভেতরে খবর দিন”।

গাড়ি ছেড়ে দেওয়া হল তাদের।

মিনিট খানেকের মধ্যেই একজন স্যুট পরিহিত ভদ্রলোক বেরিয়ে এসে তাদের দেখে শশব্যস্ত হয়ে বললেন “আসুন আসুন স্যার”।

উপমন্যু চারদিক দেখছিলেন। ভদ্রলোককে দেখে বললেন “আপনি?”

ভদ্রলোক বললেন “আমি প্রফুল্ল বসাক। এই শিফটে আমিই ইন চার্জ অফিসের”।

উপমন্যু বললেন “ওহ। আচ্ছা। চলুন আপনার অফিসে গিয়ে কথা বলা যাক”।

প্রফুল্লবাবু উপমন্যু এবং রায়কে নিয়ে অফিসে প্রবেশ করলেন।

জমজমাট ব্যস্ত অফিস। তাদের আসায় নীরব চোখ চাওয়া চাউয়ি হল। প্রফুল্লবাবু বললেন “আসুন আপনারা আমার চেম্বারে আসুন”।

প্রফুল্লবাবুর চেম্বারে গিয়ে বসলেন দুজনে।

উপমন্যু বললেন “ক’দিনের কোম্পানি এটা প্রফুল্লবাবু?”

প্রফুল্লবাবু বললেন “তিন বছর হল স্যার”।

উপমন্যু বললেন “বেশ। জয়িতা এখানে কাজ করত?”

প্রফুল্ল বললেন “হ্যাঁ। বেশিরভাগ দিন আমিই শিফট ইনচার্জ থাকতাম”।

উপমন্যু বললেন “বেশ। ওর টানা বি শিফট থাকত?”

প্রফুল্ল মাথা নাড়লেন “হ্যাঁ স্যার। অ্যাকচুয়ালি জয়িতা স্টুডেন্ট ছিল বলে ওর জন্য স্পেশাল কনসিডারেশন ছিল। আরেকটা ভাল ব্যাপার হল জয়িতা ছোট হলেও ওর পারফরম্যান্স খুব ভাল ছিল। আমাদের কোম্পানিতে খুব তাড়াতাড়ি ইন্ডাকশান হয়ে গেছিল ওর”।

উপমন্যু প্রফুল্লর চেম্বারটা মন দিয়ে দেখছিলেন।

বেশ আধুনিক ফার্নিচার দিয়ে সাজানো। দেওয়ালে সিদ্ধিদাতা গণেশের পাশাপাশি নেতাজী, মহাত্মা গান্ধীর ফটো। অপর দেওয়ালে বড় করে এক মধ্যবয়স্ক ব্যক্তির ছবি।

উপমন্যু অস্ফূটে বলে উঠলেন “শংকর মুখোপাধ্যায়। দ্য গ্রেট বাঙালি উদ্যোগপতি”।

পরমুহূর্তেই প্রফুল্লর দিকে তাকিয়ে বললেন “শংকরবাবু দেশে আছেন এখন?”

প্রফুল্ল বললেন “হ্যাঁ। স্যার বেঙ্গালুরু গেছেন”।

উপমন্যু মাথা নাড়লেন, “বেশ বেশ। অফিসে জয়িতার কাছের লোকজন কারা ছিল?”

প্রফুল্ল বললেন “সেরকম কেউ ছিল না। কল সেন্টার তো, বুঝতেই পারছেন। গল্প করার সময় তো তেমন ছিল না”।

উপমন্যু প্রফুল্লর দিকে তাকিয়ে ঠান্ডা গলায় বললেন “দেখুন প্রফুল্লবাবু, বাঙালি কল সেন্টারেই কাজ করুক কিংবা নেভিতে, মিনিট দুয়েক সময় পেলেও আড্ডা ঠিক মেরে নেবে। আর আপনি যদি মনে করেন এসবে অফিসের কাজ হ্যাম্পার হবে বা আপনি কাউকে বাঁচাতে চান, সেক্ষেত্রে সবার আগে আপনি কেস খাবেন। আমাদের জানতে কোন কিছুই বেশিক্ষণ লাগবে না সেটা আশা করি জানেন”।

প্রফুল্ল একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বললেন “সেভাবে দেখতে গেলে আসিফ, রুহি এরা ছিল। এদের মধ্যে কী সম্পর্ক ছিল সেটা অবশ্য আমি বলতে পারব না”।

উপমন্যু বললেন “এরা দুজনেই এসেছে?”

প্রফুল্ল বললেন “আসিফের আজ নাইট শিফট। রুহি আছে”।

উপমন্যু বললেন “ডাকুন”।

প্রফুল্ল ইন্টারকমে রুহিকে ডেকে পাঠালেন।

মিনিট খানেকের মধ্যে রুহি নক করল। প্রফুল্ল বললেন “কাম ইন”।
রুহি ঘরে ঢুকে একবার তাদের আরেকবার প্রফুল্লকে দেখে বললেন “ইয়েস স্যার”।
প্রফুল্ল বললেন “রুহি, ওঁরা একটু জয়িতার ব্যাপারে তোমার সঙ্গে কথা বলবেন”।
রুহি বলল “ওকে স্যার”।
উপমন্যু প্রফুল্লর দিকে তাকালেন “এই ঘরে ইন্টারোগেশন হলে আপনার আপত্তি আছে? না অন্য কোন ঘর আছে যেখানে বসা যেতে পারে”।
প্রফুল্ল রুহির দিকে তাকিয়ে বললেন “ওদের সেমিনার রুমে নিয়ে যাও”।
রুহি তাদের দিকে তাকিয়ে বলল “আসুন স্যার”।
উপমন্যু এবং রায় দুজনেই উঠলেন।
রুহির সঙ্গে প্রফুল্লর চেম্বার থেকে বেরোলেই আবার সবার কৌতূহলী চোখ পড়ল তাদের ওপর।
উপমন্যু রুহিকে বললেন “জয়িতার ডেস্ক কোথায় ছিল?”
রুহি আঙুল তুলে দেখাল।
উপমন্যু বললেন “আচ্ছা, আগে সেমিনার রুমে চলুন। পরে আসছি”।
সেমিনার রুম অন্ধকার ছিল। রুহি আলো জ্বালিয়ে দিল।
উপমন্যু এবং রায় বসলেন। রুহিও বসল।
উপমন্যু বললেন “মোবাইল রেকর্ডার অন করলে তোমার কোন আপত্তি নেই?”
রুহি বলল “না স্যার”।
উপমন্যু পকেট থেকে মোবাইল বের করে রেকর্ডার অন করে টেবিলের ওপর রাখলেন।

।।পূর্বকথা- রাত নেমে আসে আমার শরীরের ভেতর।।
শনিবার রাত।
রুহির ফ্ল্যাটে জয়িতা আর আসিফ এসেছে।
আসিফ সোফার পাশে গীটার দেখে বলল “আরিব্বাস রুহি, তুই গীটার বাজাস, বলিস নি তো একবারও?”
রুহি লজ্জা পেয়ে বলল “শিখব বলে কিনেছিলাম। এক ব্যান্ডের লীড গীটারিস্ট ক্রাশ ছিল”।
আসিফ বলল “হু, তারপর?”
রুহি হাসল “যা হয়, ক্রাশই থাকল। পরে দেখলাম সে ছেলে সবার প্রপোজালই মেনে নিচ্ছে। খুব রাগ টাগ হল”।
আসিফ গীটারের ব্যাগ থেকে গীটারটা বের করে বাজাতে বাজাতে গেয়ে উঠল “মনে পড়ে রুহি রায়, কবিতায় তোমাকে, একদিন কত করে ডেকেছি”।
জয়িতা হি হি করে হেসে বলল “ওই দেখ রুহি, আসিফ কী সুন্দর গীটার বাজায়। নে ক্রাশ খেয়ে যা”।
আসিফ রুহির দিকে তাকিয়ে হাসল। রুহি অন্যদিকে তাকাল।
জয়িতা অবাক হয়ে একবার আসিফ আরেকবার রুহির দিকে তাকিয়ে বলল “কী ব্যাপার? সামথিং ইজ কুকিং মনে হচ্ছে? আর আমি জানিও না!”
রুহি জোরে জোরে মাথা নেড়ে বলল “ধুস, কী যে বলিস না তুই? তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে?”
জয়িতা বলল “মাথা আমার খারাপ হয় নি, আমি যা বুঝছি মাথা তোরই খারাপ হয়েছে। তুই ব্যাপারটা লুকোতে গিয়ে যে ব্লাশ করে ফেলছিস সেটা বুঝতে পারছিস?”
রুহি বলল “তোরা বস আমি কফি করে আনি”।
জোর পায়ে রুহি রান্নাঘরে চলে গেল।
জয়িতা আসিফের দিকে তাকিয়ে বলল “কী ব্যাপার? তোদের লাভ স্টোরি কবে শুরু হল?”

আসিফ বলল “ধুস, কী যে বলিস। লাভ স্টোরি আবার কী? তেমন কিছুই না”।
জয়িতা চোখ বড় বড় করে বলল “জাস্ট গুড ফ্রেন্ডস,ব্লা ব্লা ব্লা ব্লা এই সব বলবি তো? বুঝতে পারছি”।
আসিফ মাথা নাড়ল “সেসব কিছুই না ইয়ার। আর এখন যা সময় এসেছে তাতে এসব ব্যাপার নিয়ে ইয়ার্কি মারিস না প্লিজ। রুহির বাড়ির লোকজন ভীষণ গোঁড়া। ওরা জানলে আমার গর্দান যাবে”।
জয়িতা সোফায় হেলান দিয়ে বসে বলল “ওহ এই ভয়? এটা কোন ভয় নাকি? নিজেরা কে কী করবি তাতে কেউ মাথা গলাবেই বা কেন? তাছাড়া আমাদের স্টেটে অত ভয়ও নেই”।
আসিফ হাত তুলল “বলছি তো সেসব কিছুই না। উই আর গুড ফ্রেন্ডস”।
জয়িতা বলল “সে তো আমরাও ফ্রেন্ডস। তুই আর রুহি যে শুধুই ফ্রেন্ডস তা তো বিশ্বাস করা যাচ্ছে না বাওয়া। আর তুই রাস্তায় যেভাবে আগে আগে হেঁটে এই ফ্ল্যাটে এলি, আমার তখনই সন্দেহ হচ্ছিল তোর ওপর। সত্যি করে বল তো, তুই আগেও এসেছিস না এই ফ্ল্যাটে?” জয়িতা চোখ ছোট ছোট করে আসিফের দিকে তাকাল।
আসিফ বলল “ওহ, সে তো অফিসে কোন কারণে বেশি রাত হলে গাড়ি চলে গেলে এক আধবার রুহিকে ছেড়ে দিতে এসেছিলাম। তাতে কী হয়? আর কী পুলিশের মত জেরা করছিস বল তো?”
জয়িতা মাথা নাড়ল, “তা ঠিক, তা ঠিক। আমিই বা কেন বেশি চাপ নিয়ে নিচ্ছি। যাক গে, এই লাভ স্টোরিটা একেবারেই অস্বাভাবিক কিছু না। ইনফ্যাক্ট ব্যাপারটা দাঁড়িয়ে গেলে আমিই খুশি হব। তোরা দুজনেই আমার খুব ভাল বন্ধু। দেখ, যদি সব ঠিক ঠাক হয় তবে আমাকে কিন্তু একটা বড় ট্রিট দিতে হবে”।
আফিস বলল “সব ঠিক ঠাক হলে তো সবার আগে তোর ট্রিট দেওয়া উচিত মা। অনীশ, দ্য গ্রেট শংকরবাবুর ছেলে, তোকে লাইন মারছে, কত বড় ধামাকা খবর এটা বলত?”
জয়িতার মুখ কালো হয়ে গেল “অনীশ একটা পারভারট শুয়োরের বাচ্চা। ওর নাম আমার সামনে বলবি না আসিফ। আগেও বলেছি, আবার বলছি”।
রুহি কফি নিয়ে চলে এসেছিল। টেবিলে ট্রে রেখে বলল “ও তোর বাড়াবাড়ি। অনীশ তো তোরই বয়সী। এই বয়সে আবার পারভারসন আসে নাকি? যদি হয়ও শংকরবাবুর কথা মাথায় রেখে তোর উচিত অনীশকে না রাগানো”।
জয়িতা ফুঁসে উঠল “কেন? ওকে অত তেল মারার কী আছে? তাছাড়া আমি এই চাকরিটাও করব না। অনীশের বাবার কোম্পানিতে চাকরি করার কোন ইচ্ছা আমার নেই”।
আসিফ বলল “চাকরি করবি না? তাহলে মাস গেলে এই যে থোক টাকাটা আসছে সেটা বন্ধ হয়ে গেলে কী করবি?”
জয়িতা বলল “এক্সপেরিয়েন্স গ্যাদার করছি। ক’দিন পরেই লাথ মারব চাকরিটাকে”।
রুহি জয়িতার হাত ধরে বলল “কেন সব সময়ে এত রেগে থাকিস অনীশের ওপরে। বল না!”

।।যেখানে দেখিবে ছাই।।
সেমিনার রুমটা ছোট, একদিকে ল্যাপটপ, প্রোজেক্টর রাখা।
কোন প্রেজেন্টেশন দেওয়ার থাকলে সেখানেই দেওয়া হয় বোঝা যাচ্ছে।
উপমন্যু রুহির দিকে তাকিয়ে বললেন “তোমাদের কাজ খুব হেকটিক তাই না?”
রুহি বলল “হ্যাঁ, তা একটু”।
উপমন্যু বললেন “বেশ। এই বয়সটা তো স্ট্রাগল করার জন্যই। যাই হোক, আমাদের তুমি একটু আলো দেখাও তো মা”।
রুহি অবাক গলায় বলল “বুঝলাম না স্যার কী বলতে চাইলেন”।

উপমন্যু বললেন "জয়িতার ব্যাপারে। আমরা কোথা থেকে তদন্ত শুরু করব এখনও পুরোটাই অন্ধকারে আছি। মেয়েটার মোবাইল পর্যন্ত রিসেট করা হয়েছে। অনেক কাঠ খড় পুড়িয়ে পুরনো ডেটা বের করতে হবে"।
রুহি বলল "আপনি আমাকে প্রশ্ন করুন, আমি যতটুকু জানি, নিশ্চয়ই বলব"।
উপমন্যু বললেন "বেশ। আমার প্রশ্ন খুব বেশি নেই। প্রথমেই বল জয়িতা কেমন মেয়ে ছিল"?
রুহি একটুও না ভেবে বলল "ভাল মেয়ে ছিল। খুব হেল্পফুল ছিল"।
উপমন্যু বললেন "বাহ। কেমন হেল্পফুল ছিল একটু এক্সাম্পেল দিয়ে বললে ভাল হয়"।
রুহি বলল "ঠিক উদাহরণ দিয়ে তো বলা যাবে না স্যার তবে বলতে পারি আমার কোন টাকার দরকার পড়লে আমি চোখ বন্ধ করে জয়িতার কাছে চাইতাম"
উপমন্যু বললেন "বেশ। ফিনান্সিয়াল হেল্প করত তার মানে। দ্যাটস গুড। আর?"
রুহি বলল "আমি ওর সঙ্গে অনেক সিক্রেটস শেয়ার করতাম"।
উপমন্যু বললেন "আর জয়িতা? ও তোমার সঙ্গে কোন রকম সিক্রেটস শেয়ার করত না?"
রুহির মুখটা এক মুহূর্তের জন্য পাংশু হয়েই আবার স্বাভাবিক হয়ে গেল। সে বলল "সেরকম কিছু না স্যার"।
উপমন্যু ঘরের চারদিকে তাকালেন। চারটে সিসিটিভি নজর রাখছে তাদের ওপর।
তিনি রুহির দিকে তাকালেন "আচ্ছা। আমার কার্ড দিয়ে যাব তোমাকে, কিছু বলার থাকলে বলতে পারো"।
রুহি মাথা নাড়ল।
উপমন্যু বললেন "বাড়িতে কে কে আছেন তোমার?"
রুহি বলল "বাবা মা"।
-বাবা কী করেন?
-ছোট ব্যবসা আছে।
-মা?
-হাউজ ওয়াইফ।
-তোমাকে কত টাকা বাড়িতে পাঠাতে হয়?
-অনেকটাই।
-তোমার কোন বয়ফ্রেন্ড আছে?
রুহি কয়েক সেকেন্ড উপমন্যুর দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়াল, "সেরকম কেউ নেই স্যার"।
উপমন্যু বললেন "বেশ। অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন, উত্তর না দিলেও পারতে। এই অফিসের লোকেদের সঙ্গে জয়িতার কেমন সম্পর্ক ছিল?"
রুহি বলল "ঠিক ঠাক। আসলে এসেই ডেস্কে বসে কাজ স্টার্ট হয়ে যায় আমাদের, আর কারও সঙ্গে কোন রকম সম্পর্ক বজায় রাখার সময়ের যথেষ্ট অভাব"।
উপমন্যু বললেন "জয়িতার বাবা মার সঙ্গে তোমার আলাপ হয়েছিল?"
রুহি দুদিকে মাথা নাড়ল।
উপমন্যু বললেন "আসিফের ডিউটি কখন?"
রুহি একটু চমকেই সামলে নিয়ে বলল "নাইট শিফট আছে"।
উপমন্যু বললেন "শুনলাম জয়িতার সঙ্গে আসিফের খুব ভাল বন্ধুত্ব ছিল। তোমার সঙ্গে কেমন আসিফের সম্পর্ক?"
রুহি ঘাড় নাড়ল "ভাল স্যার"।
উপমন্যু বললেন "তোমরা থ্রি মাস্কেটিয়ার্স ছিলে?"

রুহি মাথা নাড়ল "হ্যাঁ"।
উপমন্যু বললেন "ভেরি স্যাড। ঘটনার দিন তুমি অফিস এসেছিলে?"
রুহি বলল "হ্যাঁ। আমি এসেছিলাম। অফিসেই ছিলাম"।
উপমন্যু বললেন "আসিফ?"
রুহি বলল "ওর নাইট ছিল"।
উপমন্যু বললেন "হু। তার মানে জয়িতাকে খুন করে আসিফ ইজিলি নাইট শিফটে ঢুকে পড়তে পারত তাই তো?"
রুহি চমকে উপমন্যুর দিকে তাকিয়ে বলল "এ আপনি কী বলছেন স্যার? আসিফ জয়িতার খুব ভাল বন্ধু। ও কেন জয়িতাকে খুন করতে যাবে?"
উপমন্যু হাত দিয়ে মাছি তাড়াবার ভঙ্গি করে বললেন "ধুস, কী যে বল। বন্ধুদের মধ্যেই তো এসব বেশি হয়। দেখো কোন কিছু হয়েছিল যেটা হয়ত তোমাকে লুকিয়ে চলছিল। তুমি জানতেই পারো নি"।
রুহি রাগী গলায় বলল "এসব কিছুই হয় নি স্যার। ও এসব করতেই পারে না। জয়িতা ওর শুধুই বন্ধু ছিল"।
উপমন্যু আগ্রহী গলায় বলল "তাই নাকি? তা তুমি কী করে জানলে? এক বন্ধু জানে আজকাল আরেক বন্ধু কী করছে?"
রুহি থমথমে মুখে বসে রইল।

।।যেখানে দেখিবে ছাই।।
উপমন্যুর বাড়িতে ফিরতে রাত সাড়ে দশটা হয়ে গেল।
গাড়ি ছেড়ে দিয়ে গেছিল বাড়িতে।
বেল বাজালে পিয়ালী দরজা খুলে দিলেন।
তাকে দেখে বললেন "এত দেরী হল আজ?"
উপমন্যু জুতো খুলতে খুলতে বললেন "আর দেরী! একটা বিচ্ছিরি কেস পেয়েছি"।
পিয়ালী শ্বাস ছেড়ে বললেন "কোন কেসটা ভাল আসে? সবক'টাই তো বিচ্ছিরি"।
উপমন্যু ড্রয়িং রুমের সোফায় বসলেন "একটা মেয়ের মার্ডার করা হয়েছে। একুশ বাইশ বছর বয়স। কল সেন্টারে কাজ করত, পড়াশুনাও করত। বেশ কমপ্লিকেটেড লাগছে ব্যাপারটা। ফোনের ডেটা সযত্নে মুছে দেওয়া হয়েছে। তাতান কোথায়?"
পিয়ালী বললেন "ঘরে। আর কোথায়? সেই মোবাইল খুট খুট। আর ফাঁক পেলে কত পড়ে ওই জানে"।
উপমন্যু বললেন "খেয়েছে?"
পিয়ালী বললেন "হ্যাঁ। ডাকব?"
উপুমন্যু বললেন "থাক। আমাকে দিয়ে দাও। খেয়ে একটু রেকর্ডিংগুলো শুনি"।
পিয়ালী বললেন "পা তো ধুয়ে নাও অ্যাটলিস্ট। এভাবে খেতে বসে পড়বে নাকি?"
উপমন্যু বললেন "ওহ হ্যাঁ।তুমি খাবার দাও"।
উপমন্যু বাথরুম গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে খাবার টেবিলে বসলেন।
পিয়ালী রুটি, তরকারি আর মাছ দিলেন। নিজেও খেতে বসলেন।
উপমন্যু বললেন "রিটায়ার করলে বাঁচি। এই এক কাদা ঘাটতে ঘাটতে অবস্থা খারাপ হয়ে গেল"।
পিয়ালী বললেন "হু, তুমি নাকি বাঁচবে। তুমি রিটায়ারের পরে আবার যদি কনসালটেন্সী ফার্ম না খুলেছ তাহলে আমার নামে কুকুর পুষো"।

উপমন্যু হাসলেন “তাই নাকি? তা কী কুকুর পুষব? পাগ? না অ্যালসেশিয়ান? পিয়ালী নামের কুকুর। ভাবতেই কেমন একটা শিহরণ দিয়ে গেল মাইরি”।
পিয়ালীও হাসলেন, কপট রাগ দেখিয়ে বললেন “থাক, থাক। অনেক হয়েছে। এত রাত করে বাড়িতে এসে আর এভাবে খ্যাপাতে হবে না”।
তাতান ঘর থেকে বেরিয়ে উপমন্যুকে দেখে বলল “কী কেস? বাবা মার মধ্যে তুমুল প্রেম চলছে মনে হচ্ছে?”
পিয়ালী রাগী গলায় বললেন “আবার পাকা পাকা কথা তাতান?”
তাতান হেসে বলল “উফ, মা তুমি এত সিরিয়াস কেন সব সময়?”
উপমন্যু খেতে খেতে বললেন “তোর মার সিরিয়াস লগ্নে জন্ম জানিস না?”
পিয়ালী রাগী গলায় বললেন “আমার এসব ইয়ার্কি একদম ভাল লাগে না”।
উপমন্যু বললেন “মেয়ে বড় হলে তো মায়ের বন্ধু হয়ে যায়। তাতান তোমার বন্ধু তো এখন”।
তাতান এসে পিয়ালীর গালে আদর করে বলল “মা আমার সব সময় রেগে আছে”।
পিয়ালী বললেন “তা রাগ করব না? বার বার বলি মোবাইল রেখে পড়তে বস কিছুতেই পড়িস না। কী যে সারাক্ষণ মোবাইলে ঢুকে থাকিস তুইই জানিস”।
উপমন্যু খেতে খেতে থমকে গিয়ে বললেন “তাতান মোবাইলে কোন অ্যাপটা তুই সব চেয়ে বেশি ঘাটিস?”
তাতান একটু থতমত খেয়ে গেছিল।
পিয়ালী বললেন “কী অ্যাপ আবার? সারাক্ষণ তো কী সব গেম খেলে আর টাইপ করে যাচ্ছে। অত টাইপ করলে বই লিখে ফেলত”।
উপমন্যু পিয়ালীকে হাত তুলে থামিয়ে দিয়ে তাতানের দিকে তাকিয়ে বললেন “বল না কোন অ্যাপ?”
তাতান বলল “হোয়াটস অ্যাপ। ফেসবুক। কেন?”
উপমন্যু বললেন “কেউ যদি ফোন রিসেট করে দেয় তাহলে সব ডেটা মুছে যাবে?”
তাতান বলল “হোয়াটস অ্যাপে ব্যাপ আপ নেওয়া থাকলে সব রিস্টোর করা যায়। ফেসবুকেও যদি সব চ্যাট মুছে না দেওয়া যায় তাহলে সব থাকার কথা। হোয়াটস অ্যাপ অবশ্য সিম দিয়ে আবার ভেরিফাই করাতে হয় রিসেট করার পরে, ফেসবুকে লগ ইন করলেই কার কার সঙ্গে চ্যাট করা হয়েছে সব দেখাবে”।
উপমন্যু বললেন “আর যদি কেউ ফেসবুকের চ্যাট ডিলিট করে দেয়?”
তাতান চশমার ফাঁক দিয়ে বাবার দিকে তাকিয়ে বলল “ফেসবুকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। কেন বল তো?”
উপমন্যু চিন্তিত মুখে মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন “এক মেয়েকে খুন করে তার ফোন রিসেট করা হয়েছে। আমার সিক্সথ সেন্স বলছে ফোনে এমন কিছু ছিল যেগুলো তাড়াহুড়ো করে সরাতে গিয়ে রিসেট করা হয়েছে”।
তাতান বলল “রিসেট করেছে? প্যাটার্ন লক বা ফিঙ্গার প্রিন্ট যাই থাক, রিসেট করতে হলে কিন্তু সেগুলো জানতে হবে। আর ফেসবুক হোয়াটস অ্যাপ কেন, ফোনে ফটো থেকে শুরু করে অনেক কিছুই থাকে। রিসেট করার আগে কী ছিল তা জানতে ফোন কোম্পানির সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে, তাও জানিনা উদ্ধার হবে নাকি। আর ফোন সিকিউরিটি চেক না করে ফরম্যাট করবে না”।
উপমন্যু বললেন “অথবা মেয়েটিকে না জানিয়ে ফোন আনলক করতে পেরেছিল খুনী।হু... চিন্তার ব্যাপার”।
তাতান বলল “কোন মডেল ফোনের?”
উপমন্যু বলতে যাচ্ছিলেন এমন সময় পিয়ালী রাগী গলায় বললেন “সারাদিন অফিস করে খাওয়ার টেবিলেও এই শুরু করেছ? দয়া করে খেয়ে আমাকে উদ্ধার কর প্লিজ। খেয়ে টেয়ে যা ইচ্ছা কর”।
উপমন্যু অন্যমনস্কমুখে খেয়ে যেতে লাগলেন।

রাত এগারোটা পনেরো। উপমন্যু নিজের ঘরে ল্যাপটপ খুলে বসেছেন তার ফোনটা বেজে উঠেই থেমে গেল।
উপমন্যু দেখলেন একটা মিসড কল।
কল ব্যাক করলেন নম্বরটাতে। একবার পুরোটা রিং হয়ে কেটে গেল।
উপমন্যু ভ্রু কুচকালেন। নাম্বারটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে ভাবলেন একবার কার নাম্বার জানার জন্য রায়কে পাঠাবেন।
তার ফোনটা আবার বেজে উঠল। সেই নাম্বার থেকেই ফোনটা আসছে।
উপমন্যু ধরলেন "হ্যালো"।
"মিস্টার উপমন্যু বসু বলছেন?" ওপাশের পুরুষ গলাটা একটু সামান্য কাঁপছে।
উপমন্যু বললেন "বলছি। আপনি কে বলছেন?"
"স্যার আমি আসিফ বলছি। রুহি আপনাকে ফোন করতে বলল"।
উপমন্যু বললেন "ওহ, বুঝেছি। তুমি ফোন করে কেটে দিলে কেন? ভয় পাচ্ছিলে নাকি যে পুলিশ ছুলে আঠারো ঘা?"
ওপাশে একটু থেমে আসিফ বলল "সেরকমই খানিকটা। রুহি একটু ভয় পেয়েছে আসলে। আমাকে বার বার বলছিল আপনাকে ফোন করতে। আমি অফিসে এসে তাই একটু ব্রেক নিয়ে আপনাকে ফোন করছি"।
উপমন্যু হাসলেন "ঠিক আছে, তুমিও যে ঘাবড়েছ সেটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। এখন নাইট শিফটে আছো, সারারাত তোমাকে জেগে থাকতে হবে, এখন আর বেশি টেনশন দেব না তোমায়। কাল তুমি কখন কীভাবে দেখা করতে পারবে জানাও"।
আসিফ একটু ভেবে বলল "স্যার আমি ফিরে একটু ঘুমাই। আপনি বললে তার পরের সময়টা দেখা করে নিতে পারি। সকাল দশটা নাগাদ"।
উপমন্যু বললেন "ওকে। তুমি কোথায় থাকো?"
আসিফ বলল "কসবায় স্যার"।
উপমন্যু বললেন "ঠিক আছে। তুমি ফিরে ঘুম থেকে উঠে আমাকে ফোন কোর। আমি কাছা কাছি কোন জায়গায় তোমার সঙ্গে দেখা করে নেব। গুড নাইট"।
আসিফ বলল "গুড নাইট"।
উপমন্যু ফোনটা কাটলেন। মাথায় হাত দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ চিন্তিত মুখে তাকিয়ে ফোন করলেন সাইবার ক্রাইম ডিপার্টমেন্টে। ওপাশ থেকে ফোন তুলতেই উপমন্যু বললেন "নায়েককে দাও তো। আমি বোস বলছি"।
একটু অপেক্ষা করতে হল। নায়েক ধরলেন "হ্যাঁ স্যার"।
উপমন্যু বললেন "ফোনটা থেকে কি কিছু পাওয়া গেল?"
নায়েক বললেন "হ্যাঁ স্যার। রিকোভারি করা হয়েছে"।
উপমন্যু বললেন "আমাকে জানালে না কেন?"
নায়েক বললেন "স্যার এই মিনিট পাঁচেক হল জাস্ট। আমি ভাবলাম আপনি ঘুমিয়ে..."
উপমন্যু ধমক দিলেন "কোন দুনিয়ায় আমি এত তাড়াতাড়ি ঘুমাই হে? রায় তোমাকে বলে নি যখনই ডেটা পাবে আমাকে জানিয়ে দেবে?"
উপমন্যুর ঝাড় খেয়ে নায়েক একটু সামলে নিয়ে বললেন "সরি স্যার"।
উপমন্যু বললেন "হু। বল কী কী উদ্ধার হল"।

নায়েক বললেন "ফোন মেমোরিতে রাখা বেশ কিছু গ্যালারির ফটো, মেসেজ, উদ্ধার করা গেছে। দুটো সিম ছিল ফোনে। কোনটায় হোয়াটস অ্যাপ ছিল বের করে হোয়াটস অ্যাপ ব্যাক আপ রিস্টোর করা হচ্ছে এখন"।
উপমন্যু নড়ে চড়ে বসলেন "কতক্ষণ লাগবে সেটা পেতে?"
নায়েক বললেন "হার্ডলি আর আধ ঘন্টা"।
উপমন্যু বললেন "ফেসবুক?"
নায়েক বললেন "পেয়ে যাবেন স্যার সকালের মধ্যে"।
উপমন্যু বললেন "তোমার প্ল্যান কী? সারারাত থাকছ আজ?"
নায়েক বললেন "হ্যাঁ স্যার। থেকে যাব আজ। কাল থেকে তিন দিন থাকব না। একটু মন্দারমণি যাব"।
উপমন্যু বললেন "একটু যাবে কেন? পুরোপুরি যাও, কিন্তু আমাকে অথৈ জলে ভাসিয়ে রেখে যেও না। সব কিছু উদ্ধার করে দিয়ে তবেই যেও"।
নায়েক বললেন "সে তো নিশ্চয়ই স্যার। ওসব চিন্তা করবেন না"।
উপমন্যু বললেন "চিন্তা আমি করি না। আমি জানি আমাদের ডিপার্টমেন্ট চাইলে সবই করতে পারে। সমস্যাটা হল ব্যাপারটা পুরোপুরি চাওয়ার ওপর নির্ভর করছে"।
নায়েক হেসে ফেললেন "কী যে বলেন স্যার। আগের মাসেই একটা বড় ডাকাতি কেস শুধু ফোন ট্রেস করে বের করে দিয়েছি আমরা। একটু সময় দিতে হবে তো। এই ফোনটা উদ্ধার করা এমন কিছুই কঠিন ছিল না। সময় লাগল এই যা"।
উপমন্যু বললেন "হোয়াটস অ্যাপ ডেটা, ফেসবুক ডেটা অ্যালং উইথ অল ইমেজ ফাইল আমাকে পাঠাবে। যত রাতই হোক। আর শোন, মন্দারমণিতে ফোন অফ করে রাখবে না। আমার আরও দরকার পড়তে পারে"।
নায়েক বললেন "শিওর স্যার"।
উপমন্যু ফোনটা রেখে ল্যাপটপে মন দিলেন।

১৯ সেপ্টেম্বর, রাত ১১টা ২৯ মিনিট
।।জয়িতার হোয়াটস অ্যাপ।।
-হাই।
-হাই।
-থ্যাঙ্কস হোয়াটস অ্যাপ নাম্বার দেওয়ার জন্য।
-ইউ আর লাকি হুহ। কাউকে দিই না আমি। মানে নাম্বার।
-হা হা হা। তাহলে সত্যিই লাকি। আমাকেই দিলে। মানে নাম্বার।
-(হাসির ইমোজি) তবে মানতেই হবে তুমি ভাল বাজাও।
-হ্যাঁ আমি ভালই বাজাই।
-ঈশ (বাদরের দু হাত দিয়ে মুখ ঢাকা ইমোজি)। আমি গীটারের কথা বললাম।
-আমিও তো গীটার বাজানোর কথাই বললাম। তুমি কী ভাবলে?
-(মুখ অন্য দিকে তাকানোর ইমোজি)
-কী হল? বল কী ভাবলে?
-কিছু না। লিভ ইট।
-ওকে। লিভ করলাম। কী করছ?
-কিছু না। শুয়ে আছি। টায়ার্ড।

-ওহ। খুব কাজ করলে বুঝি?
-হ্যাঁ। অফিসে। কল সেন্টার জব। বোঝোই।
-হু হু।
-তুমি কী কর?
-ওই যে, বললাম তো। বাজাই।
-(মুখ বাকানোর ইমোজি) উফ। বেশি ফাজিল তুমি।
-এই না, সত্যি। একটা ব্যান্ডে গীটার বাজাই।
-ওকে।
-ইমপ্রেস হলে না?
-না না। এ আবার কী?
-না মানে ব্যান্ডে গীটার বাজিয়ে কী আর হয়।
-ধুস। আমি সেসব ভাবিই নি।
-তা ঠিক। দুদিন তো ফেসবুকে কথা হল জাস্ট। কী আর ভাববে?
-হু। তুমি খুব বেশি ভাবো নাকি?
-হ্যাঁ। আমি তো ধুম সিরিজের উদয় চোপড়া স্টাইল ভাবি। বউ, দুই বাচ্চা, ছেলে হলে কী নাম হবে। মেয়ে হলে কী নাম হবে। সব।
-(দু চোখ দিয়ে জল বেরোনোর ইমো) ঈশ। জঘন্য একেবারে। জঘন্য...
- (একই ইমো)
-তুমি এর আগে কত জনের সঙ্গে এসব ভেবেছ?
-বেশি না। এখনও সেঞ্চুরি হয় নি। তবে মার্কেটের প্রবলেম হল সবাই কমিটেড। তুমি কমিটেড?
-আমি? না।
- ঢপ মেরে দিলে?
- হা হা বিলিভ মি। না।
-হু। থাক।
-আচ্ছা। অনেক রাত হল। এখন ঘুমাই।
-এখন তো বারোটা সবে। এখনই ঘুমাবে?
-হ্যাঁ। কাল আবার কত কাজ। বেশিক্ষণ জেগে থাকলে গোটা দিনে টায়ার্ড হয়ে থাকি।
-ওকে। গুড নাইট। কাল কথা হবে।
-গুড নাইট।

২০ সেপ্টেম্বর, সকাল ৮টা ২০ মিনিট
-গুড মর্নিং জয়িতা।
-গুড মর্নিং।
-উঠলে?
-হ্যাঁ। এই তো জাস্ট।
-তোমার কথা ভাবছিলাম।
-উফ। জাস্ট এক রাতে ভাবাভাবিও শুরু করে দিলে?
- হা হা হা। তা ঠিক। তোমার মধ্যে একটা ব্যাপার আছে। ইউ আর ভেরি কিউট।
-থ্যাংক ইউ। তবে বেশি মাখন লাগাতে হবে না।

-ওকে ওকে। লাগাব না।
-হু। আমি উঠি এখন। ব্রেক ফাস্ট দেবে এখনই। না খেলে মিস।
-ওকে। রাতে পিং কোর ফিরে। বাই।
-বাই।

একই দিন। রাত এগারোটা পনেরো
-ফিরলে?
-হ্যাঁ। ডিনার কমপ্লিট।
-আজ অফিস পার্টি ছিল বুঝি? ফটোগুলো দেখলাম।
-নাথিং স্পেশাল। একটু হল।
-মদ খেলে?
-হ্যাঁ। স্কচ ছিল।
-ওয়াও। দেখি, মাতাল সেলফি একটা।
-উম্মম… না প্লিজ…
-দেখি না প্লিজ।
-ওকে, ওয়েট…
-(একটা সেলফি গেল এদিক থেকে)
-ওয়াও। স্টিল বিউটিফুল। অ্যান্ড…
-অ্যান্ড কী?
-ক্লিভেজ দেখা যাচ্ছে। (জিভ বের করা ইমোজি)
-দেখে নাও। ফ্রি হে।
-(চোখ থেকে জল বের করা ইমোজি) ইউ আর ভেরি স্মার্ট। ভেরি বিউটিফুল।
-ন্যুড চাই বুঝি?
-ছি ছি। কী যে বল।
-চাইলে দিই না। স্ট্রিক্ট রেস্ট্রিকশনস আছে।
-রিয়েলি? কে দিয়েছে রেস্ট্রিকশন?

---একই সময়ে অনীশ পিং করছে---
-ওই জয়িতা… স্টানিং লাগছিল আজকে। আই রিয়েলি লাইকড ইউ টুডে।
কোন রিপ্লাই নেই।
…

জয়িতা অন্য চ্যাটে রিপ্লাই দিচ্ছে "কেউ দেয় নি। নিজেই নিজেকে দিয়েছি।এসব দেওয়ার জিনিস না"।
-আমি চাইবও না। নো ইস্যু।
-ওয়াও। জেন্টল ম্যান।
---অনীশ আবার পিং---
-হে জয়িতা। প্লিজ রিপ্লাই। মিসিং ইউ। সেন্ড ন্যুডস প্লিজ।
…

জয়িতা অনীশকে কোন রিপ্লাই করে নি। অন্য চ্যাটে ছেলেটাকে লিখেছে "আমি টায়ার্ড আছি। এখন যাচ্ছি, বাই, পরে কথা হবে"।
অনীশ বেশ কয়েকবার প্লিজ লিখে কাঁদার ইমোজি দিয়েছে।

২১শে সেপ্টেম্বর, সকাল সাড়ে আটটা
-গুড মর্নিং।
-গুড মর্নিং...
-কালকে তোমার ছবিটা দেখে সারারাত ঘুমাই নি জানো।
-(হাসার ইমোশন) সকাল সকাল বাটার মেরো না।
-আমরা দেখা করতে পারি? উইকেন্ডে?
-হুউউ, ভাবব।

একই সময়ে রজত একটা মিম পাঠিয়েছে জয়িতাকে। রুহি একটা মজার ভিডিও পাঠিয়েছে। বেশ কয়েকটা "হাই" এসেছে মেসেজে, জয়িতা কাউকেই রিপ্লাই দেয় নি।
উপমন্যু একগাদা পাতার চ্যাট হিস্ট্রির প্রিন্ট আউট এখনও পড়তে হবে দেখে একটা হাই তুললেন।
ছেলেটার নাম আকাশ। ফোন করলেন ছেলেটাকে, একটা রিং হতেই একটা ঘুম জড়ানো গলা ভেসে এল "কে বে?"
"আমি সি আই ডি থেকে বলছি। আকাশ বলছ?"
ওপাশ থেকে একগাদা খিস্তি ভেসে এল "বোকাচোদা, সকালে উঠেই প্র্যাংক কল শুরু করে দিয়েছিস? ধরে বাম্বু ভরে দেব"।
উপমন্যু শান্ত গলায় বললেন "শোন বাবা, তুমি অনেক ছোট আমার থেকে। গালাগাল দিও না। একটা কথা বলি শুধু তোমায়, জয়িতা, যার সঙ্গে রাতে চ্যাট করতে তুমি, সে মার্ডার হয়েছে। তুমি আজ কোথায় দেখা করবে বল, আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাই"।
ওপাশ থেকে কোন শব্দ পাওয়া গেল না। সম্ভবত ফোনটা হাত থেকে পড়ে গেছে আকাশের।
নিউ আলিপুর।
বাড়ির নাম "দ্য গ্রীন ল্যান্টার্ন"।
বাড়ির গেট বন্ধ ছিল। সিকিউরিটিকে পরিচয় দিতে দরজা খুলে দিল।
অনেকটা বাগান পেরিয়ে গাড়িবারান্দায় গাড়ি পৌঁছতে এক ভদ্রলোক পুলিশের গাড়ি দেখে এগিয়ে এলেন।
উপমন্যু গাড়ি থেকে নেমে আই কার্ড দেখিয়ে বললেন "অনীশ মুখোপাধ্যায় আছেন?"
ভদ্রলোক ফোন বের করে কারো সঙ্গে কথা বলে উপমন্যুকে বললেন "ভেতরে আসুন স্যার"।
উপমন্যু বললেন "আপনি?"
ভদ্রলোক বললেন "আমার নাম লক্ষণ পাল। আমি শংকরবাবুর সেক্রেটারি"।
উপমন্যু বললেন "শংকরবাবু আছেন?"
লক্ষণ বললেন "স্যার এই কিছুক্ষণ আগে ফিরেছেন। বিশ্রাম নিচ্ছেন"।
উপমন্যু বললেন "অনীশ?"
লক্ষণ বললেন "আছেন। আপনি বসুন প্লিজ এসে"।
উপমন্যু বাড়ির ভেতরে গেলেন।
ড্রয়িং রুমে বসানো হল তাকে। উপমন্যু ঘরটা দেখছিলেন।

ঘরের দেওয়ালে বিভিন্ন সেলিব্রিটির সঙ্গে শংকর মুখোপাধ্যায়ের ছবি, আসবাবপত্র প্রতিটি অত্যন্ত দামী দেখে বোঝাই যাচ্ছে। ঘরের সর্বত্র বাহুল্যের ছড়াছড়ি।
অনীশ এল। বেশ লম্বা চেহারা। ফর্সা। চেহারার মধ্যে একটা কাঠিন্য আছে। ঘুমাচ্ছিল সম্ভবত তাই চোখ ফোলা। উপমন্যু অনীশকে মন দিয়ে দেখছিলেন।
উপমন্যু বললেন "আপনি অনীশ?"
অনীশ মাথা নাড়ল।

উপমন্যু বললেন "আপনার খানিকটা সময় নেব"।
অনীশ অবাক গলায় বলল "আমার? কেন বলুন তো?"
উপমন্যু হাসিমুখে বললেন "এক যুবতী খুন হয়েছেন। সেই ব্যাপারেই আর কী। আপনি জয়িতা নামে কাউকে চিনতেন?"
অনীশ উপমন্যুর দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে বলল "এই নামে অনেককেই চিনি আমি"।
উপমন্যু তার মোবাইলটা অনীশের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন "দেখুন একে চেনেন নাকি"।
অনীশ বেশ কয়েক সেকেন্ড জয়িতার ছবির দিকে তাকিয়ে মোবাইলটা উপমন্যুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল "চিনি"।
উপমন্যু থেমে থেমে বললেন "জয়িতা খুন হয়েছে অনীশ"।
অনীশ একটু চমকে উপমন্যুর দিকে তাকিয়ে বলল "ওহ"।
উপমন্যু বললেন "জয়িতার সঙ্গে আপনার হোয়াটস অ্যাপ চ্যাট আমরা পড়েছি"।
অনীশ আবার চমকাল। বলল "আমি একটু আসছি। আপনি বসুন"।
উপমন্যু তীক্ষ্ণ চোখে অনীশের দিকে তাকিয়ে বললেন "বেশ। আমি আছি"।
সামনে রাখা টেবিলের ওপর খবরের কাগজ রাখা ছিল। উপমন্যু একটা কাগজ নিয়ে পড়তে শুরু করলেন। মিনিট পাঁচেক বাদে একটা ভারিক্কি গলা কানে এল তার "নমস্কার অফিসার"।
উপমন্যু দেখলেন শংকর মুখোপাধ্যায় এসে দাঁড়িয়েছেন।
উপমন্যু বললেন "ওহ, হোয়াট আ সারপ্রাইজ। আমি ভাবতেই পারি নি আপনার সঙ্গে দেখা হবে"।
মাঝারি ঝকঝকে চেহারাটা থেকে ব্যক্তিত্ব ঝলসে পড়ছে। শংকরবাবু উপমন্যুর দিকে তাকিয়ে বললেন "প্লিজ বসুন অফিসার। আপনাকে কিছু অফার করা হয়েছে?"
উপমন্যু বসে বললেন "না ইটস ওকে। আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে ভাল লাগল শংকরবাবু। বাঙালির ব্যবসা হয় না, এ অপবাদ আপনি ঘুচিয়েছেন"।
শংকরবাবু সোফায় বসে বললেন "তা ঠিক। তবে কী জানেন তো অফিসার, ব্যবসায় অনেক মানসিক চাপ থাকে। এত চাপ সহ্য করে টিকে থাকাটাও খুব কঠিন কাজ"।
উপমন্যু বললেন "তা বটে। বাঙালি ভঙ্গুর জাতি। একটু চাপ থাকলেই তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়ে। দুয়েকটা উদাহরণ বাদে অবশ্যই। সবাই তো আর সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় কিংবা শংকর মুখোপাধ্যায় হয় না"।
শংকরবাবু খুশি হলেন সৌরভের পাশে তার নামটা শুনে। বললেন "অনেক ধন্যবাদ অফিসার। যাই হোক, আপনি লক্ষ্মণের কাছে শুনেছেন হয়ত আমি একটু আগেই ফিরেছি। রেস্ট নিচ্ছিলাম এমন সময় আমার ছেলে অনীশ আমাকে ডেকে বলল আপনি এসেছেন। ওকে একটু ভীতও মনে হল। কী হয়েছে একটু খোলসা করে বলবেন প্লিজ?"
উপমন্যু বললেন "অনীশের সহপাঠী একটি মেয়ে, জয়িতা নাম। খুন হয়েছে। সে ব্যাপারেই তদন্ত করতে কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করছি যাতে খুনের ব্যাপারে কিছু কিনারা করা যায়। অনীশের এত ভয় পাওয়ার তো কিছু হয় নি"।

শংকরবাবু চিন্তিত মুখে উপমন্যুর দিকে তাকিয়ে বললেন "সর্বনাশ। এই টুকু বয়সের মেয়ে খুন হয়ে গেল? সত্যিই ব্যাপারটা যথেষ্ট বেদনাদায়ক মেয়েটির বাবা মায়ের কাছে। অনীশের মা নেই, আমাকে সর্বক্ষণ ওর ব্যাপারে চিন্তা করতে হয়, খবর নিতে হয় ছেলেটা বখে যাচ্ছে না তো... বুঝতেই পারছেন, দিন কাল ভাল নয়। প্রাচুর্য থাকলে সমস্যা কমার পরিবর্তে বেড়ে যায় আজকের দিনে"।
উপমন্যু বললেন "একজ্যাক্টলি স্যার। আমিও বুঝেছি অনীশ খানিকটা ভয়ই পেয়েছে। আমি বেসিক কয়েকটা প্রশ্ন করতে পারলেই খুশি হতাম। এর বেশি কিছু নয়"।
শংকরবাবু গলা বাড়িয়ে ডাকলেন "লক্ষণ?"
লক্ষণ আশে পাশেই ছিলেন। শংকরবাবুর গলা পাওয়া মাত্র ঘরে প্রবেশ করলেন।
শংকর বললেন "অনীশকে ডেকে দাও। আর নন্দিনীকে বল স্যারের জন্য... আপনি কফি খাবেন?"
উপমন্যু বললেন "চিনি ছাড়া"।
শংকর লক্ষণের দিকে তাকালেন "চিনি ছাড়া কফি। আমাকেও দিতে বল"।
লক্ষণ ঘর থেকে বেরলেন।
অনীশ মিনিট খানেকের মধ্যে ঘরে এল।
শংকর অনীশের দিকে তাকিয়ে বললেন "উনি একটা ব্যাপারে তোমার সঙ্গে কথা বলতে এলেন আর তুমি ভয় পেয়ে আমাকে ডাকতে চলে গেলে?"
অনীশ খানিকটা চমকে বাবার দিকে তাকাল।
শংকর কড়া গলায় বললেন "কেউ যদি সৎ হয় তবে তাকে কোন কিছুর আড়ালে থাকতে হয় না। মনে রেখো বিন্দুমাত্র অপরাধ করলেও তোমার বাবা তোমার পাশে থাকবে না, কিন্তু তুমি যদি নির্দোষ হও তবে আর কেউ থাকুক না থাকুক আমি আছি সব সময়। অফিসার যা যা জিজ্ঞেস করবেন তার প্রত্যেকটা উত্তর সঠিক দেবে। আমার আড়ালে লুকোনোর চেষ্টা করবে না। আমি তোমায় কোন রকম সাহায্য করব না মনে রেখ"।
অনীশ মাথা নীচু করল।
শংকর উপমন্যুর দিকে তাকিয়ে বললেন "কফিটা এক সঙ্গে খেয়ে নেওয়া যাক অফিসার। তারপর আপনি ওর থেকে যা যা জানার সব জানতে পারেন। আমি আপনার তদন্তের কাছে কোন রকম বাধা দেব না"।
উপমন্যু মাথা নিচু করে শংকরকে অভিবাদন জানিয়ে বললেন "বাংলার ঘরে ঘরে আপনার মত বাবা হোক শংকরবাবু"।

কফি এল একটু পরে। অনীশ মাথা নিচু করে বসে ছিল।
শংকর কফির কাপ উপমন্যুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন "কিছু যদি মনে না করেন অফিসার, আমি জানতে পারি ব্যাপারটা সম্পর্কে?"
উপমন্যু কফিতে চুমুক দিয়ে বললেন "ক্রাইমের সংজ্ঞা পাল্টাচ্ছে শংকরবাবু। এই কিছুদিন আগেও ক্রাইমে একটা ডাইমেনশন কম ছিল। এখন একটা চমৎকার ডাইমেনশন যুক্ত হয়েছে, ইন্টারনেট। ছেলে মেয়েরা কৈশোরে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সত্যজিত পড়ত, এখন হোয়াটস অ্যাপে জোক পড়ে। মিম তৈরী করে। সেখানে অফেন্সিভ কন্টেন্ট তৈরী করতে পারলে গৌরবান্বিত হয়। কিছুদিন আগেই আমরা একটা ষোল বছরের ছেলেকে ধরেছিলাম, সে ফেসবুকে বিভিন্ন মানুষকে নিয়ে কুরুচিকর মিম বানাতো। ছবি পেলেই হল। মিম তৈরী। যৌন ইঙ্গিতকারী মিম। অনুমতি না নিয়েই সে সব ছবি প্রোফাইল থেকে নেওয়া হত। জিজ্ঞাসাবাদ করায় আমাদের একগাদা বিদেশী নাম বলে বোঝাল এগুলো দোষের কিছু নয়। মানুষ অফেন্ডেড হলেই নাকি তাদের জিত। তারা মনে করে মানুষ যতক্ষণ সহ্য করতে পারছে গোটা ব্যাপারটা, যতক্ষণ মানুষের সহ্যসীমায় পুরো ব্যাপারটা থাকছে ততক্ষণ কোন মজাই নেই। সবটাই অসহ্য করাতেই

তাদের জয়। ব্যাপারটা একবারে খারাপও কি বলতে পারি আমরা? এটা পরিবর্তিত মানসিকতা। এই পরিবর্তিত মানসিকতার সঙ্গে এই সমসাময়িক মনস্তত্ত্ব না বুঝতে পারলে সমূহ বিপদ"।

শংকর অনীশের দিকে তাকিয়ে উপমন্যুকে বললেন "বয়সটা একটা ফ্যাক্টর অফিসার। সব কিছু পেয়ে যাওয়াটাও। বাবার হোটেলে বসে, দু চারটে ইংরেজি টিভি সিরিজ দেখে নিজেকে বড় কিছু মনে করাটা এ প্রজন্মের একটা সমস্যা। ওর বয়সে আমরা রীতিমত মাঠে খেলা দেখতে যেতাম। ইডেন গার্ডেনস ছিল আমাদের শীতকালের স্বর্গ। এখন টি টুয়েন্টি এসেছে, খেলার থেকে জুয়া বেশি। বাই দ্য ওয়ে অনীশ, যে মেয়েটি খুন হয়েছে, তার চাকরির ব্যাপারেই তুমি আমাকে বলেছিলে তাই না?"

অনীশ সামান্য চমকে বাবার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল।

উপমন্যু অনীশের দিকে তাকিয়ে বললেন "আপনার জয়িতার প্রতি দুর্বলতা ছিল?"

অনীশ এক মনে পায়ের নখের দিকে তাকিয়েছিল। শংকর কফির কাপ হাতেই উঠে বললেন "আমি ভেতরে গেলাম অফিসার। ওর আমার সামনে সংকোচ হতে পারে কথা বলতে"।

উপমন্যু উঠে দাঁড়ালেন "সারটেনলি স্যার'।

শংকর ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

উপমন্যু অনীশের দিকে তাকিয়ে বললেন "হোয়াটস অ্যাপ চ্যাটগুলো পড়েছি বুঝতে পেরেছেন আশা করি। গড়পঞ্চকোটে কী হয়েছিল অনীশ যে সে রাতে জয়িতা কলকাতা ফিরে যাওয়ার জেদ ধরে?"

অনীশ এবার উপমন্যুর দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে রাগী গলায় বলল "আপনি আমাকে ফোন করতে পারতেন। বাবাকে জানানোর কি খুব দরকার ছিল?"

উপমন্যু বললেন "আপনি যদি দোষী প্রমাণিত হন সেক্ষেত্রেও কি আপনার বাবা না জানলেই আপনি খুশি হবেন?"

অনীশ বলল "আপনি জানেন না, আমার বাবা আমাকে সব সময় নিচু নজরে দেখে, সবার সামনে ছোট করে। আজ বাবা সুযোগ পেয়ে গেল শুধু আপনার জন্য"।

উপমন্যু বললেন "বেশ তো, আপনার সুযোগ আছে প্রমাণ করার যে আপনাকে যেমন দেখতে মনে হয় আপনি সেরকম নন। আপনাকে যা যা জিজ্ঞেস করা হবে তার উত্তর ঠিক ঠাক দিন, আপনার বাবাই আপনাকে নিয়ে গর্বিত হবে"।

অনীশ রাগী চোখে কয়েক সেকেন্ড উপমন্যুর দিকে তাকিয়ে বলল "জয়িতা ওয়াজ আ বিচ। একটা হোর। আপনি খোঁজ নিন। অনেক কিছু জানতে পারবেন ওর সম্পর্কে"।

উপমন্যু ঠান্ডা মাথায় বললেন "আমি তো জয়িতা সম্পর্কে আপনার অপিনিয়ন চাই নি। আমি জাস্ট জানতে চাইছি গড়পঞ্চকোটে কী হয়েছিল যে কারণে জয়িতা কলকাতায় ফিরে যেতে চায়?"

অনীশ বড় বড় চোখ করে উপমন্যুর দিকে তাকাল। চারদিকে দেখল। মাথা নিচু করে হাতের আঙুলে শব্দ করতে লাগল।

উপমন্যু বললেন "ইট ওয়াজ এ ডিল তাই না? তুমি জয়িতাকে চাকরি দেবে তার পরিবর্তে জয়িতা তোমার সঙ্গে শোবে? রাইট?"

অনীশ টেবিলে রাখা জলের গ্লাস নিয়ে এক নিঃশ্বাসে জল শেষ করে বলল "বললাম তো শি ইজ এ বিচ। সেদিন একবারও বলে নি... পৌঁছে জানাল শি ওয়াজ অলরেডি প্রেগন্যান্ট"।

উপমন্যু চমকালেন না। শুধু অস্ফূটে বললেন "দিস কেস ইজ গেটিং ফাকিং ইন্টারেস্টিং"।

হোয়াটস অ্যাপ ইনবক্স- জয়িতা

রুহিকে করা মেসেজ

২৫শে সেপ্টেম্বর সকাল আটটা।
-ওই। উঠেছিস?
-বল।
-একটা হেল্প চাই।
-বাবাহ। এত ভনিতার কী আছে? বল।
-ফেঁসে গেছি ইয়ার।
- (বড় বড় চোখ করা ইমোজি) মানে?
-প্রেগা নিউজ। পজিটিভ।
-ফাক। রিয়েলি?
-হু। জাস্ট চেকড।
-ফাক ফাক ফাক। দাঁড়া ফোন করছি।
...
রাত সাড়ে এগারোটা
রুহি- কী রে? কিছু হল?
জয়িতা- না। কাউকে বলিস নি তো?
-না না পাগল নাকি তুই?
-ভাল্লাগছে না। কী যে হল!
-তাকে জানিয়েছিস?
-না। কী হবে জানিয়ে?
-তাও ঠিক। টেক কেয়ার রে। চিন্তা করিস না, ওষুধ আছে। শুধু মনটা শক্ত রাখ।
-বাড়ি যেতে ইচ্ছা করছে খুব।
-মাকে ফোন কর বরং।
-ধুস! এত রাতে সব ঘুমিয়ে পড়েছে।
-ওকে। ঘুমিয়ে পড় তাড়াতাড়ি। দেরী করিস না।
-হ্যাঁ রে। বাই।
-বাই।

।।যেখানে দেখিবে ছাই।।
মেস বাড়িতে বেল বাজাতে আকাশ দরজা খুলল। উপমন্যু ঘরে ঢুকে চারদিকে তাকিয়ে বললেন “জেলা?”
আকাশ বলল “হ্যাঁ”।
উপমন্যু বললেন “কোন জেলা?”
আকাশ বলল “হুগলী”।
উপমন্যু বললেন “গুড। ইন্টারেস্টিং। তা তোমার বন্ধুরা তোমায় খুব প্র্যাঙ্ক করে বুঝি?”
আকাশ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বলল “ওই আর কী”।
উপমন্যু বললেন “তোমার খাট কোনটা?”
আকাশ একটা খাট দেখাল। উপমন্যু একটা চেয়ার টেনে খাটের সামনে বসে মোবাইল বের করে বললেন “রেকর্ড করতে পারি?”
আকাশ বলল “শিওর”।
“তুমি মিউজিশিয়ান?”

আকাশ বলল “হ্যাঁ স্যার”।
“কিছু হয় রোজগার গান বাজনা করে?”
আকাশ বলল “খুব বেশি না”।
উপমন্যু বললেন “বেশ। আচ্ছা সরাসরি ভনিতা ছেড়ে কাজের কথাতেই আসি। ওই মেয়েটি, কী যেন নাম... হু, জয়িতা, দেখা করেছিলে?”
আকাশের মুখ কালো হল। সে একটু ভেবে বলল “হ্যাঁ স্যার। একদিন”।
উপমন্যু বললেন “কোথায়? চ্যাট শুরু করার ক’দিন পরে?”
আকাশ বলল “ফোরামে”। একটু ভেবে বলল “দু তিন দিন পরেই। কবে ভুলে গেছি”।
উপমন্যু বললেন “তারপরে আর দেখা হয় নি?”
আকাশ মাথা নাড়ল “না”।
উপমন্যু বললেন “কেন? তুমি যথেষ্ট হ্যান্ডসাম। দেখা না হওয়ার কারণ নেই অন্তত মেয়ের পক্ষ থেকে”।
আকাশ বলল “আমরা যেদিন দেখা করলাম সেদিন শুরু থেকেই জয়িতা অন্যমনস্ক ছিল। অন্য কিছু ভাবছিল। আমি যখন বললাম সিনেমা দেখবে, তখন আমাকে কাচু মাচু মুখে “সরি, আমার অন্য কাজ আছে” বলে চলে গেল। আমি নিজেও বুঝতে পারি নি ঠিক কী হয়েছিল ওর। ফোন করেছিলাম, ধরে নি, হোয়াটস অ্যাপ ফেসবুকেও ব্লক করে দিয়েছিল। আমি এখনও জানি না, ঠিক কেন সেদিন ওইরকম অদ্ভুত বিহেভিয়ার করেছিল”।
উপমন্যু বললেন “তারপর?”
আকাশ মাথা নাড়ল “তার আর পর নেই। ওই শেষ”।
উপমন্যু বললেন “এরকম তো হতে পারে, ঘটনাটার পরে তোমার মেয়েটার ওপর এক ধরণের আক্রোশ তৈরী হয়, তুমি মেয়েটাকে স্টক করতে শুরু কর এবং রাগের মাথায় খুন কর”।
আকাশ বলল “না স্যার। আমার এত ক্রাইসিস নেই। আপনি চাইলে আমার হোয়াটস অ্যাপ, ফেসবুক চেক করতে পারেন। জয়িতা ওয়াজ বিউটিফুল আনডাউটেডলি, বাট এরকম কোন ক্রাইসিস তৈরি হয় নি আমার মধ্যে যার জন্য জয়িতাকে খুন করতে হবে। ইনফ্যাক্ট সে ঘটনার কিছুদিন পরে আমি একটা স্টেডি রিলেশনেও গেছিলাম। কালিপুজো অবধি টিকেছিল সে সম্পর্কটা”।
উপমন্যু বললেন “তারপর কী হল?”
আকাশ হেসে বলল “ব্রেক আপ। আমার মত লক্ষীছাড়াদের প্রথম প্রথম খুব ইন্টারেস্টিং লাগে, গীটার, গান, জ্যামিং, কিন্তু মেয়েরা অন্য কিছু চায় লাইফ থেকে। তারা চায় আমি সব ছেড়ে ছুঁড়ে তাকেই সময় দিই। এর সঙ্গে না মিশে তার সঙ্গে মিশি। এবং সব শেষে গান টান চুলোয় রেখে একটা সরকারি চাকরি খুঁজি যাতে সে তার বাবার কাছে বুক চিতিয়ে বলতে পারে দেখো বাবা তোমার জন্য একটা ভাল জামাই এনেছি”।
উপমন্যুও হাসলেন। বললেন “তুমি নারীবিদ্বেষী?”
আকাশ বলল “তা নয়, নারীবিদ্বেষী কেন হতে যাব স্যার, নারীরা হল ফাইনেস্ট ক্রিয়েশন অফ গড উইথ আ লিটল ছিট। সমস্যাটা হল আমাকে ওই ছিটটাই টানে”।
উপমন্যু বললেন “জয়িতার খুন হবার কথা শুনে তোমার খারাপ লাগে নি?”
আকাশ বলল “ডেফিনিটলি। শি ওয়াজ এ নাইস গার্ল”।
উপমন্যু বললেন “জয়িতা তোমাকে তার যে ছবি পাঠিয়েছিল সেটা তোমার মোবাইলে এখনও আছে?”
আকাশ বলল “না স্যার। ডিলিট করে দিয়েছি”।
উপমন্যু আকাশের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে বললেন “ঠিক আছে। আমার কার্ড রাখো। কোন কিছু মনে পড়লে ফোন করব”।

উপমন্যু কেষ্টপুরে পৌঁছলেন দুপুর নাগাদ। বাড়িটা চিনতে একটু অসুবিধে হল কিন্তু শেষমুহূর্তে পেয়ে গেলেন। একটা দোতলা বাড়ি। উপমন্যু কলিং বেল বাজালে এক ভদ্রলোক দরজা খুললেন।
উপমন্যু বললেন "বিনয়বাবু আছেন?"
ভদ্রলোক তার দিকে তাকিয়ে বললেন "আপনি?"
উপমন্যু আইডি বের করে দেখালেন "পুলিশ ইনভেস্টিগেটর"।
ভদ্রলোক দরজা থেকে সরে দাঁড়িয়ে বললেন "আসুন। ওঁরা এই খেয়ে উঠলেন"।
দরজার পাশেই সিঁড়ি। সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় গেলেন উপমন্যু। ভদ্রলোক পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। উপমন্যু বললেন "আপনারই বাড়ি?"
ভদ্রলোক বললেন "হ্যাঁ। আমার শালা হন বিনয়"।
উপমন্যু আর কিছু বললেন না। বসার ঘরে একটা চেয়ারে বসিয়ে ভদ্রলোক ভেতরের ঘরে গেলেন। খানিকক্ষণ পরে এক লম্বা ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। চোখ মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে একটা ঝড় বয়ে গেছে তার ওপর। উপমন্যু উঠে হাত জোর করে বললেন "বিনয়বাবু আমি উপমন্যু। আপনার মেয়ের কেসটা আমিই দেখছি। আপনাকে বেশি বিরক্ত করব না। প্লিজ বসুন"।
বিনয়বাবু খানিকটা বিহ্বল চোখে তার দিকে তাকিয়ে তইলেন বেশ কিছুক্ষণ। তারপর সোফায় মাথা নিচু করে বসলেন। উপমন্যু বললেন "আমি অত্যন্ত দুঃখিত এই পরিস্থিতিতে আপনার সঙ্গে কথা বলতে এলাম। কিন্তু আশা করি আপনিও বুঝতে পারছেন এই মুহূর্তে সব চেয়ে জরুরি আপনার মেয়ের খুনিকে খুঁজে বের করে তাকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া"।
বিনয়বাবু কয়েক সেকেন্ড মেঝের দিকে তাকিয়ে বললেন "এনি প্রোগ্রেস অফিসার?"
উপমন্যু বললেন "এই মুহূর্তে বেশ কয়েকটা সূত্র ধরে আমরা এগোচ্ছি। আশা করছি খুব তাড়াতাড়ি কোন না কোন একটা ক্লু পেয়ে যাব যাতে খুব শিগগিরি কেসটার কিনারা করে ফেলতে পারি"।
বিনয়বাবু উপমন্যুর দিকে তাকালেন এবার। স্থির চোখে তাকিয়ে বললেন "আপনাদের ওপর আমার পূর্ণ আস্থা আছে। আমি জানি, নিশ্চয়ই আপনি কেসটার কিনারা করবেন অফিসার"। বিনয়বাবুর কথা থেমে থেমে আসছিল। বোঝাই যাচ্ছিল ভদ্রলোকের ভেতরটা ভেঙেচুরে যাচ্ছে।
উপমন্যু বললেন "শুনলাম আপনি ব্যবসায়ী"।
বিনয়বাবু মাথা নাড়লেন "রঙের ব্যবসায়ী। কিন্তু বিশ্বাস করুন খুব বেশি টাকা আপনাদের দেওয়ার মত আমার নেই। জমানো টাকা যা ছিল, আগের মাসেই..."
উপমন্যু বললেন "না না, আপনি যেটা ভাবছেন সেটা নয়। কলকাতা পুলিশ এখনও এতটা হৃদয়হীন হয়ে যায় নি যে একজন কন্যাহারা বাবার থেকে তাদের টাকা নিয়ে সে কেসের কিনারা করতে হবে। আমি শুধু আপনার সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলাম"।
বিনয়বাবু ঘোলাটে চোখে উপমন্যুর দিকে তাকিয়ে বললেন "ছোট ব্যবসা আমার। মেয়ের চাকরিটা যে কী দরকার ছিল স্যার, তা আর কী বলব। ভাবতেও পারবেন না আমাদের মত ছোট ছোট পরিবারে একজন আরনিং মেম্বার বাড়লে কতখানি লাভ হয়"।
বিনয়বাবু চুপ করে গেলেন।
উপমন্যু বললেন "আপনার স্ত্রী"।
বিনয়বাবু বললেন "ওর সঙ্গে আর কথা বলে কী করবেন। সারাক্ষণ কেঁদে যাচ্ছেন"।
উপমন্যু কিছু একটা বলতে গিয়েও চুপ করে গেলেন। বললেন "জয়িতা যখন প্রথম কলকাতায় পড়তে এল টাকা জোগাতে সমস্যা হয় নি?"
বিনয়বাবু বললেন "হয়েছিল। ধারদেনা করে পড়তে পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু মেয়ে নিজেই চাকরি পেয়ে সে সব দেনা শোধ করে দিয়েছিল"।

উপমন্যু বললেন “ওর কোন সম্পর্কের কথা আপনাকে বা আপনার স্ত্রীকে কোন দিন বলেছিল জয়িতা?”
বিনয়বাবু ক্লান্ত ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন।
উপমন্যু বললেন “আপনারা হয়ত জানেন না, খুনের কিছুদিন আগে জয়িতার অ্যাবরশন হয়েছিল”।
বিনয়বাবু উপমন্যুর দিকে খানিকটা চমকে তাকিয়েই শান্ত হয়ে গেলেন।
বললেন “ও”।
উপমন্যু বললেন “ওর কোন ছেলে বন্ধু সম্পর্কে কোন দিন আপনাদের কিছু বলেছিল জয়িতা?”
বিনয় মাথা নাড়লেন “না, কলকাতায় আসার পরে আমাদের সঙ্গে ওর খুব বেশি কথা হত না। মাকে ফোন করত বেশি, টাকার দরকার ছাড়া আমার সঙ্গে বেশি কথা হত না”।
উপমন্যু বললেন “বেশ। আপনারা কতদিন থাকবেন এখানে?”
বিনয়বাবু বললেন “যত তাড়াতাড়ি কেসটার সুরাহা হবে”।
উপমন্যু বললেন “সেক্ষেত্রে আমাকে আপনার স্ত্রীর সঙ্গেও কথা বলতে হবে বিনয়বাবু”।
বিনয়বাবু মাথা নিচু করে সোফা থেকে উঠে পাশের ঘরে গেলেন।

খানিকক্ষণ পরে বিনয়বাবু তার স্ত্রী কৃষ্ণাকে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন।
কৃষ্ণাদেবীর চোখমুখে স্বামীর থেকেও বেশি শোকের ছাপ।
চোখের তলায় কালি, চোখ ফুলে গেছে।
উপমন্যু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন “আমি ভীষণ দুঃখিত ম্যাডাম এই সময়ে আপনার সঙ্গে কথা বলতে আসতে হল, কিন্তু আমি নিরূপায়। আশা করি আমার অসহায়তাটা আপনি বোঝার চেষ্টা করবেন”।
কৃষ্ণাদেবী কোন কথা না বলে বসলেন। বিনয়বাবু বললেন “বুঝতেই পারছেন অফিসার ব্যাপারটা যত সংক্ষিপ্ত করা যায়, তত ভাল”।
উপমন্যু মাথা নাড়লেন, “ডেফিনিটলি। আমি নিজেও একজন মেয়ের বাবা বিনয়বাবু। আপনাদের মানসিক অবস্থা একটু হলেও বোঝার ক্ষমতা আমার আছে”।
বিনয়বাবু স্ত্রীর দিকে তাকালেন। কৃষ্ণাদেবী মুখে আঁচল চাপা দিয়ে বললেন “বলুন আপনার কী জানার আছে”।
উপমন্যু একটু থেমে বললেন “মেয়ের সঙ্গে আপনার কেমন কথা হত?”
কৃষ্ণা বললেন “রোজ রোজ হত না তবে এক দু দিন পর পর হত”।
উপমন্যু বললেন “মেয়েকে শেষ কবে দেখেছিলেন?”
কৃষ্ণা বললেন “মাস তিনেক আগে বাড়ি এসেছিল। তখনই”।
উপমন্যু বিনয়বাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন “জয়িতা যে বাড়িতে পেয়িং গেস্ট থাকত সে বাড়ির কাউকে আপনি সন্দেহ করেন?”
বিনয়বাবু মাথা নাড়লেন “না”।
উপমন্যু বললেন “আপনারা দুজন কাউকে সন্দেহ করেন?”
বিনয়বাবু বললেন “জয়িতা যখন শিলিগুড়িতে ছিল, ক্লাস ইলেভেনে একটা ছেলে ওকে অ্যাসিড বাল্ব ছুঁড়ে মারার হুমকি দিয়েছিল। কিন্তু সে ছেলে এখনও শিলিগুড়িতেই থাকে। বিয়ে থা করেছে। কলকাতায় আমি ওর কোন বন্ধুকেই তেমন চিনতাম না। তাই সেভাবে বলতে পারব না”।
কৃষ্ণা বললেন “আমাদের কোন কথা বললে তো। মেয়ে চিরকালই বড্ড চাপা। আমাকে ফোন করলেও খুব বেশি কথা কোন দিনই বলত না’।
উপমন্যু চিন্তিত মুখে বিনয়বাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন “জয়িতার ফোনের সব ডেটা মুছে দেওয়া হয়েছিল। আমরা তার অনেক খানি রিকভার করেছি। গত সাত আটদিনে কোন উড়ো ফোন বা চিঠি পেয়ে ছিলেন

আপনারা?”
দুজনেই মাথা নাড়লেন।
উপমন্যু বললেন “আপনাদের যদি আমাকে কিছু বলার থাকে তবে বলতে পারেন। মনে রাখবেন যত বেশি কিছু আমার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখবেন, জয়িতার খুনীকে ধরতে আমাদের তত বেশি দেরী হবে”।
বিনয়বাবু বললেন “তা কেন অফিসার? আপনার কনট্যাক্ট নাম্বার তো আমাদের কাছে থাকবে, যদি পরে মনেও কিছু পড়ে তবে আপনাদের অবশ্যই ফোন করে বলব”।
উপমন্যু বললেন “জয়িতার ছেলে বন্ধুদের সঙ্গে আপনাদের কখনো কথা বা দেখা হয়েছে?”
কৃষ্ণা বললেন “আমি আপনাকে বললাম না, মেয়ে আমাদের ভীষণ চাপা। ও যদি মনে করত কোন কথা আমাদের বলবে না, তাহলে শতবার জানতে চাইলেও কিচ্ছু বলত না”।
কৃষ্ণা কাঁদতে শুরু করলেন, “আমি জানি কোন ছেলেই ওর এই হাল করেছে। চিরটাকাল মেয়েটার উপর অনেকের নজর। সবাই বলত তোমার মেয়েটা কত সুন্দর। সেই সুন্দর হওয়াটাই কাল হল…”
বিনয়বাবু ক্লান্ত গলায় বললেন “কাগজে খবর বেরিয়েছে। আমাদের এলাকায় সবাই বারবার ফোন করছে। এত সহানুভূতিও আমি আর নিতে পারছি না। একটাই মেয়ে আমাদের। জোর করল কলকাতায় গিয়ে পড়াশুনো করবে। আগে পিছে না ভেবে ধার করে পাঠালাম। চাকরি পেল যখন তখন মনে হল আমাদের পরিশ্রম সার্থক। কিন্তু এ ঘটনা আমাদের সব কিছু ওলট পালট করে দিয়ে গেল। আমাদের বেঁচে থাকার অবলম্বনই যে চলে গেল। খবরটা পেয়ে কীভাবে যে কলকাতায় ছুটে এলাম আমরা দুজন তা আমরাই জানি। আপনিই বলুন, মেয়ের বাবা মা হওয়া কি আজকের দিনে অপরাধ অফিসার?”
উপমন্যু অন্যমনস্কভাবে একটা সিগারেট ধরালেন। বললেন “এই বাড়িতেও তো জয়িতা থাকতে পারত। তা না করে পেয়িং গেস্টে থাকতে গেল কেন?”
বিনয়বাবু চারদিকে তাকিয়ে বললেন “ও কিছু সমস্যা ছিল। আমার দিদির ছেলে…”
উপমন্যু বললেন “ওহ। বুঝলাম। আচ্ছা ম্যাডাম, আপনার মেয়ে আপনাকে জানিয়েছিল সে প্রেগন্যান্ট”?
কৃষ্ণাদেবী মাথা নিচু করে দুদিকে মাথা নাড়ালেন।
বিনয়বাবু বললেন “প্লিজ অফিসার, এসব প্রশ্ন এখন থাক”।
উপমন্যু উঠলেন “ঠিক আছে। কোন কথা মনে পড়লে আমায় ফোন করবেন প্লিজ। আমি এলাম”।

উপমন্যু কেষ্টপুর থেকে যখন বেরোলেন দুপুর পেরিয়ে বিকেল হয়েছে। ড্রাইভার দেবু বলল “অফিসে যাব?”
উপমন্যু বললেন “নাহ। ধাপার মাঠের দিকে চ একবার”।
দেবু অবাক হয়ে বলল “ধাপার মাঠ?”
উপমন্যু অন্যমনস্ক গলায় বললেন “হ্যাঁ। চিংড়িহাটা পেরিয়ে স্পিড কম করবি, আমি বলে দেব কোন জায়গা থেকে লেফট টার্ন নিতে হবে”।
দেবু আর কোন প্রশ্ন না করে গাড়ি স্টার্ট দিল। উপমন্যু মোবাইলের নোটপ্যাড বের করে নিজের মনে বেশ কয়েকটা নাম লিখে আবার কেটে দিলেন।
অফিস ছুটি হবার সময়। রাস্তায় গাড়ির ভিড় বাড়ছে। উপমন্যু গাড়ির জানলার বাইরে দিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে বিড় বিড় করে বললেন “এই সময়ে জয়িতা কল সেন্টারে ঢুকত। ঘটনার দিন কোথায় ছিল? আসিফ এখনও ফোন করল না তো আমাকে?”
উপমন্যু আসিফের নম্বরে ফোন করলেন। ফোনটা বেশ কয়েকটা রিং হবার পর ফোন তুলল আসিফ “হ্যালো”।
উপমন্যু বললেন “তোমার সকালে ফোন করার কথা ছিল আসিফ”।
“হ্যাঁ স্যার, অ্যাকচুয়ালি অফিস থেকে ফিরে এত টায়ার্ড থাকি যে…”

“ওকে। তোমাকে বেনিফিট অফ ডাউট দেওয়া যায়। আজ তোমার কী ডিউটি”?
“আজকেও নাইট স্যার”।
“বেশ। এক কাজ কর, তুমি সোনার বাংলা হোটেলের কাছে চলে এসো। কসবা থেকে তো বেশি দূর হবে না”।
“ইয়ে মানে... কেন স্যার”?
“এমনি, কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করার আছে। চলে এসো। চিন্তা কোর না, বেশিক্ষণ আটকে রাখব না। ইজিলি নাইট ডিউটি ধরতে পারবে। জলদি এসো। আমি লেক টাউন ক্রস করছি”।
আসিফকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে ফোনটা কেটে দিলেন উপমন্যু।
জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালেন। শহর বদলাচ্ছে। ক্রাইমের প্রকৃতিও। এই প্রজন্ম বড় দ্রুত আত্মীকরণ করে নিচ্ছে নতুন পদ্ধতি। এর সঙ্গে যদি তাদের তদন্ত পদ্ধতি না বদলায় তবে অপরাধী সনাক্তকরণের ক্ষেত্রে প্রচুর সমস্যা তৈরী করবে।
কন্ট্যাক্ট লিস্ট ঘেঁটে একটা নাম্বার ডায়াল করলেন উপমন্যু। একটা রিং হতেই ওপ্রান্ত থেকে ফোন তুলল “হ্যাঁ স্যার। ভাল আছেন?” গলাটা তেলতেলে। উপমন্যু হাসলেন। বললেন “তুমি কেমন আছো বিল্টু?”
“ভাল না স্যার। অনেকদিন আপনি কোন কাজ দিচ্ছেন না। কী করে ভাল থাকি বলুন তো?”
“তা ঠিক। তা বিল্টুবাবু, তোমাকে যে এক খান কাজ করতে হবে”।
“নিশ্চয়ই স্যার। এতো ভারি ভাল কথা বললেন স্যার। কাকে ফলো করতে হবে?”
“আপাতত একটা বাড়ির ওপর নজর রাখতে হবে। ঢাকুরিয়ায়। দিন রাত, চব্বিশ ঘন্টা। কে আসছে, কে যাচ্ছে সব ছবি তুলে আমাকে হোয়াটস অ্যাপ করতে হবে। পারবে?”
“হ্যাঁ স্যার। কেন পারব না? আপনি ব্যাস আমাকে বাড়ির ঠিকানা পাঠিয়ে দিন। আর ইয়ে স্যার...”
“বলে ফেল”।
“পেমেন্ট আজকাল পেটিএমেও নিচ্ছি”। ওপাশ থেকে হাসির শব্দ ভেসে এল।
উপমন্যুও হাসলেন, “আমি প্রাচীনপন্থী। পেমেন্ট ক্যাশেই করব। তিন দিন আগে নজর রাখো, তারপর দেখছি”।
“ওকে স্যার। আপনি যেমন বলবেন। কোন জোরাজুরি নেই স্যার”।
ফোনটা রেখে ঢাকুরিয়ার বাড়ির ঠিকানা বিল্টুকে হোয়াটস অ্যাপে পাঠালেন উপমন্যু। দেখলেন আসিফ ফোন করছে তাকে। ধরলেন “বল আসিফ”।
“স্যার, ইয়ে মানে বলছি আজকে না গেলে হত না? একটু কাজ ছিল আজ”।
উপমন্যু বললেন “কেন বল তো? রুহি বারণ করল তোমাকে?”
আসিফ ঘাবড়ে গিয়ে বলল “না না সেরকম কিছু না স্যার। আসলে বুঝতেই তো পারছেন, রুহী বাচ্চা মেয়ে, একটু ভয় পেয়ে যাচ্ছে”।
উপমন্যু বললেন “রুহী বাচ্চা মেয়ে, তুমি বাচ্চা ছেলে, কিন্তু তোমরা যেটা বুঝতে পারছ না, সমস্যা যদি কিছু থেকেও থাকে, আর তোমরা নির্দোষ হও, তাহলে যত তাড়াতাড়ি আমার কাছে উগড়াতে পারবে, তত তোমরা নিশ্চিন্তে থাকবে। নইলে সমস্যা দুজনের ক্ষেত্রেই বাড়বে। বুঝতে পারছ আমি ঠিক কী বলতে চাইছি”?
আসিফ বলল “হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পারছি, আমি বেরচ্ছি এখনই। বেশি দেরী হবে না স্যার”।
উপমন্যু ফোন রাখলেন। উল্টোডাঙা পেরিয়ে গাড়ি ধীর গতিতে এগোচ্ছে। ই এম বাইপাসে জ্যাম আছে। উপমন্যু বিরক্ত মুখে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলেন।
#

আসিফ সুপুরুষ। চোখে মুখে একই সঙ্গে ক্লান্তি এবং ভয়ের ছাপ স্পষ্ট। উপমন্যু আসিফকে ফোন করে ধাপার রাস্তার মুখে আসতে বলেছিলেন। আসিফকে অনেকটা হেঁটে আসতে হল।
বিকেল পেরিয়ে সন্ধ্যে নামছে চারদিকে। শহরের বুকে অন্ধকার নেমে আসছে দ্রুত।
উপমন্যু বললেন "তোমাকে খানিকটা হাটালাম। কিছু মনে করলে না তো?"
আসিফ বলল "না স্যার। ঠিক আছে"।
উপমন্যু বললেন "এখানে এসেছ আগে?"
আসিফ বলল "না স্যার"।
উপমন্যু বললেন "ঠিক তো?"
আসিফ বলল "হ্যাঁ স্যার। আসি নি"।
উপমন্যু বললেন "চল, হাঁটতে হাঁটতে কথা বলা যাক। ক্রাইম সীনটা ডিসকাস করি"।
আসিফ একটু চমকাল। তবে উপমন্যুর সঙ্গে হাঁটতে শুরু করল।

"আসিফ"।
"হ্যাঁ স্যার"।
"খুনটা এই জায়গার কাছে পিঠেই হয়েছিল"।
উপমন্যু একটা সিগারেট ধরালেন। আসিফ কোন কথা বলল না।
উপমন্যু বললেন "জয়িতা তোমার কেমন বন্ধু ছিল আসিফ?"
"ভাল বন্ধু স্যার"।
"তুমি জানতে জয়িতা প্রেগন্যান্ট ছিল?"
কয়েক সেকেন্ড নীরবতার পর আসিফ বলল "হ্যাঁ স্যার"।
উপমন্যু বললেন "কে ছিল এর পেছনে, সেটা জানতে?"
আসিফ বলল "না স্যার"।
উপমন্যু সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন "কিছুই জানতে না অথচ জয়িতাকে তুমি আর রুহি ক্লিনিকে নিয়ে গেলে অ্যাবর্ট করাতে?"
আসিফ বলল "সব কথা আমাকে রুহি বলে না স্যার"।
উপমন্যু বললেন "তুমি রুহিকে ভালোবাসো?"
আসিফ আবার একটু থমকে বলল "হ্যাঁ"।
উপমন্যু বললেন "রুহির বাড়ি থেকে মানবে?"
আসিফ বলল "মানবে না। স্বাভাবিক"।
উপমন্যু বললেন "তোমার বাড়ি থেকে?"
আসিফ বলল "সমস্যা হবে"।
উপমন্যু বললেন "তোমরা ক্লোজ ফ্রেন্ড ছিলে আসিফ। আমি তোমার থেকে অনেক বেশি ইনফরমেশন এক্সপেক্ট করি জয়িতা সম্পর্কে। কী লুকোচ্ছ বলতো? কে প্রেগন্যান্ট করেছিল জয়িতাকে? অনীশ?"
আসিফ বলল "জানি না স্যার। বিশ্বাস করুন"।
উপমন্যু বললেন "রুহি জানে? সেক্ষেত্রে রুহিকে থানায় ডাকতে হবে"।
আসিফ খানিকটা উত্তেজিত হয়ে বলল "দেখুন স্যার, কাজের ক্ষেত্রে জয়িতা আমাদের বন্ধু ছিল বটে কিন্তু জয়িতার মেলামেশা শুধু আমাদের সঙ্গেই ছিল না। অনেকের সঙ্গেই ওর সম্পর্ক ছিল। ইনফ্যাক্ট জয়িতা ঠিক আমাদের মত ছিল না"।
উপমন্যু উৎসুক হয়ে বললেন "সেটাই তো জানতে চাইছি। কেমন ছিল জয়িতা?"

আসিফ খানিকটা কুঁকড়ে গিয়ে বলল "জয়িতা একটু ছেলেঘেষা টাইপ ছিল। মাঝে মাঝে একটা পাগলামি গ্রাস করত ওকে। ইনফ্যাক্ট... ওকে নিয়ে আমার আর রুহির মধ্যেও একবার ভুল বোঝাবুঝি তৈরী হয়েছিল"।
উপমন্যু বললেন "আচ্ছা? কেমন ভুল বোঝাবুঝি?"
আসিফ অস্বস্তি মাখা গলায় বলল "জয়িতা মাঝে মাঝেই কারণে অকারণে আমাকে জড়িয়ে ধরত। রুহি সেটা নিতে পারত না। ওর ধারণা ছিল জয়িতা ইচ্ছা করেই করে। আমি জয়িতাকে একবার আলাদা করে বোঝাতেও গেছিলাম, কিন্তু জয়িতা হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিল। বলেছিল বন্ধুদের মধ্যে এসব হতেই পারে। এতে এত চাপ নেবার কিছু নেই"।
উপমন্যু বললেন "জয়িতা সুন্দরী ছিল। তোমাকে জড়িয়ে ধরলে তোমার শরীর জাগত না আসিফ?"
আসিফ খানিকটা ঝাঁঝ দেখিয়ে বলল "এ কেমন কথা বলছেন স্যার"?
উপমন্যু ঠান্ডা গলায় বললেন "কাম অন আসিফ, তুমিও পুরুষ মানুষ আমিও পুরুষ মানুষ। একজন সুন্দরী নারীর সাহচর্য তোমার পৌরুষকে জাগাত না, আমাকে বিশ্বাস করতে বোল না"।
আসিফ গোঁ ধরা গলায় বলল "ওসব আপনার হতে পারে, আমার হয় না। আমি রুহিকে ছাড়া কারো কথা ভাবতে পারি না"।
উপমন্যু সিগারেটটা ফেলে পায়ের তলায় পিষতে পিষতে বললেন "ভালোবাসা আজকের দিনে আছে? স্ট্রেঞ্জ। ক'টা বাজে এখন আসিফ?"
আসিফ খানিকটা রাগী গলায় জবাব দিল "সাড়ে ছ'টা। আমি কি এখন ছুটি পেতে পারি?"
উপমন্যু বললেন "ছুটি আমরা সবাই চাই আসিফ। কিন্তু ছুটি পাওয়া কি এতই সহজ? দেখো না, প্রতিটা ক্রাইমের পর আমরা প্রার্থনা করি, এটাই শেষ ক্রাইম হোক। কিন্তু হয় কি? হয় না? মানুষ যতদিন আছে, ততদিন ক্রাইম থাকবে। যতদিন ক্রাইম থাকবে, ততদিন কারো ছুটি হবে না। আচ্ছা, অনীশ সম্পর্কে তোমার কী মতামত?"
আসিফ বিরক্ত গলায় বলল "বড়লোকের বখাটে ছেলে। জয়িতাকে বিরক্ত করত। জয়িতা ওকে একেবারেই পাত্তা দিত না"।
উপমন্যু শিষ দিতে দিতে বললেন "জয়িতার চাকরিটা অনীশ ব্যবস্থা করে দিয়েছিল জানো?"
আসিফ বলল "জানি। তবে জয়িতা যথেষ্ট ডিজারভিং ছিল। অনীশ ব্যবস্থা না করলেও জয়িতা চাকরিটা নিজের যোগ্যতাতেই পাওয়ার ক্ষমতা রাখত"।
উপমন্যু বললেন "অনীশ কীভাবে বিরক্ত করত জয়িতাকে?"
আসিফ বলল "অফিসেও চলে আসত মাঝে মাঝে। জয়িতাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে অবান্তর কথা বার্তা বলত"।
উপমন্যু বললেন "তোমাদের শিফট ইনচার্জ কিছু বলতেন না?"
আসিফ বাঁকা হেসে বলল "অফিসের মালিকের ছেলেকে বলবে, কার ঘাড়ে দুটো মাথা আছে?"
উপমন্যু চিন্তিত গলায় বললেন "হু... চল তোমাকে তোমার মেসে ছেড়ে দিয়ে আসি"।
আসিফ বলল "তার দরকার হবে না। আমি চলে যাব"।
উপমন্যু বললেন "আহ। চলই না। কোন সমস্যা নেই। তোমাকে নামিয়ে দিয়ে আমি ঢাকুরিয়া যাব"।

গাড়ি রুবির কাছে পৌঁছতে আসিফ একটু ইতস্তত করে বলল "আমাকে এখানেই নামিয়ে দিন স্যার"।
উপমন্যু বললেন "কেন? তোমার মেসে গেলে প্রবলেম আছে কোন?"
আসিফ বলল "মানে স্যার পুলিশের গাড়ি দেখলে পাড়ার লোক একটু অন্য রকম কিছু ভাবতে পারে আর কী"।

উপমন্যু মাথা নাড়লেন "রাইট। দেবু, ওকে নামিয়ে দিস রুবির মোড়ে। আচ্ছা আসিফ, আমি ভুলে গেছি, তোমার কি রোজ নাইট থাকে?"
আসিফ মাথা নাড়ল "না, এই তো নেক্সট ফ্রাইডে থেকে বি শিফট আছে"।
উপমন্যু বললেন "বাড়িতে কে কে আছে তোমার?"
আসিফ বলল "তিন ভাই, দুই বোন"।
উপমন্যু বললেন "কী করে তিন ভাই"?
আসিফ বলল "ছোট ভাই স্কুলে পড়ে। বড় দুজনের একজন একটা রাবার ফ্যাক্টরিতে কাজ করে, আরেকজন টোটো চালায়"।
উপমন্যু বললেন "রুহিকে বিয়ে করার পরে রুহি তোমার সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করতে পারবে?"
আসিফ মাথা নিচু করল। উত্তর দিল না।
উপমন্যু বললেন "প্রবলেম হল লাভ স্টোরিগুলো যখন শুরু হয় তখন কেউ সামনে পিছনে ডাইনে বায়ে দেখে না। সমস্যা শুরু হয় এর পরে। আশা করি তোমার গল্পটা ঠিক ঠাক হবে"।
আসিফ এবারেও উত্তর দিল না। উপমন্যু বললেন "রুহির ফ্ল্যাটে তুমি গেলে ওর অ্যাপার্টমেন্টের বাকি লোকজন আপত্তি করে না?"
আসিফ খানিকটা চমকে উঠেই বলল "আমি যাই না সেভাবে স্যার"।
উপমন্যু বললেন "সেভাবে তো যাও না, কোন ভাবে তো যাও। গেলে কিছু বলে না"।
আসিফ বলল "না, সেরকম কোন সমস্যা এখনও হয় নি"।
রুবির মোড় এসে গিয়েছিল। দেবু গাড়ি সাইড করল। উপমন্যু বললেন "সাবধানে যেও। কোন রকম কোন কথা মনে পড়লে আমাকে ফোন করবে। মনে রেখো, সাপ্রেশন অফ ফ্যাক্ট কিন্তু তুমি নির্দোষ হলেও সন্দেহের তীর তোমার দিকেই নিয়ে যাবে। আশা করছি তুমি যথেষ্ট ইন্টেলিজেন্ট সেটা বোঝার জন্য"।
আসিফ বলল "মনে থাকবে স্যার"।
আসিফ নেমে গেল গাড়ি থেকে। উপমন্যু বললেন "ঢাকুরিয়া চ দেবু। দেখি ওখানে আবার নতুন কোন আপডেট এল নাকি"।
#
আধঘন্টা লাগল ঢাকুরিয়া পৌঁছতে। উপমন্যু গাড়ি থেকে নেমে কলিঙ বেল বাজালে বিশ্বজিৎবাবু দরজা খুলে দিলেন।
উপমন্যু হাসিমুখে বললেন "ওহ আপনি এসে গেছেন? যাক ভালই হল"।
বিশ্বজিৎ দরজা ছেড়ে দাঁড়িয়ে বললেন "হ্যাঁ। এই মাত্র এলাম। চা চলবে তো অফিসার?"
উপমন্যু বললেন "হ্যাঁ। তা চলবে। আচ্ছা নীলম ফিরেছে?"
বিশ্বজিৎ বললেন "হ্যাঁ। ফিরেছে ঘরে আছে"।
উপমন্যু বললেন "আমার নীলমের সঙ্গে একটু দরকার ছিল। ওকে ডাকা যাবে?"
বিশ্বজিৎ বললেন "শিওর স্যার। ডেকে দিচ্ছি। আপনি বসুন"।
উপমন্যু ড্রয়িং রুমে ঢুকে দেখলেন সুশান্তবাবু কাগজ পড়ছেন। বললেন "কী খবর আপনার? শরীর টরীর ঠিক আছে তো?"
সুশান্তবাবু বললেন "তা ভাল, কিন্তু মানসিকভাবে ভাল নেই বুঝতেই পারছেন। যে বাড়িতে এমন কান্ড হয়, সে বাড়ির মালিক ভাল থাকে কী করে?জীবনের শেষ প্রান্তে এসে এ কেমন একটা বিচ্ছিরি ব্যাপার হয়ে গেল বলুন তো?"
উপমন্যু হাত দিয়ে মাছি তাড়াবার ভঙ্গি করে বললেন "ওসব নিয়ে একবারেই চিন্তা করবেন না আপনি। এত বড় শহরে এসব অনেক জায়গাতেই হয়। আর জীবনের শেষপ্রান্ত কী বলছেন? বিদেশীরা আপনার বয়সে

জীবন শুরু করে বুঝলেন?"
সুশান্তবাবু হেসে বললেন "তা ঠিক বলেছেন। তবে কী জানেন তো, বয়স হয়েছে তো, শরীরের কলকব্জাগুলি মাঝে মাঝেই বিদ্রোহ করে ওঠে। সব সামলে সুমলে ওঠা বড়ই সমস্যা আর কী"।
উপমন্যু বললেন "ডাক্তার দেখান আপনি নিয়মিত?"
সুশান্তবাবু বললেন "বার্ধক্যের সব সমস্যা কি আর ডাক্তার ঠিক করতে পারে বলুন?"
উপমন্যু বললেন "তা ঠিক"।
নীলমকে নিয়ে বিশ্বজিৎ ঘরে ঢুকলেন। উপমন্যু বললেন "আমি নীলমের সঙ্গে আলাদা করে একটু কথা বলতে চাই। কোন ঘর পাওয়া যাবে?"
বিশ্বজিৎ বললেন "আমাদের ঘরেই কথা বলতে পারেন। আসুন না"।
উপমন্যু নীলমের দিকে তাকালেন। নীলমের মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেছিল।
উপমন্যু বললেন "ভয়ের কিছু নেই মা। রুটিন দুটো প্রশ্ন করেই আমি চলে যাব। তুমি চিন্তা কোর না"।
নীলম আর কিছু বলল না।
বিশ্বজিতের ঘরে তমালিকা টিভি দেখছিলেন। বিশ্বজিৎ বলতে বাইরে চলে গেলেন। নীলম আর উপমন্যু ঘরে ঢুকলেন। উপমন্যু বললেন "প্রশ্নটা তোমাকে থানায় ডেকেও করা যেত কিন্তু তোমাকে বিব্রত করতে চাই নি। বস।"
নীলম খাটের ওপর বসল। উপমন্যু একটা চেয়ার টেনে বসলেন। বললেন "স্কুল গেছিলে আজ?"
নীলম মাথা নাড়ল।
উপমন্যু বললেন "দেখো নীলম, তোমাকে একটা কথা বলি। তুমি বাচ্চা মেয়ে, আমার মেয়েরই কাছাকাছি বয়স তোমার, তুমি হয়ত জানো না, পুলিশের কাছে তথ্য লুকোলে ঠিক কী কী সমস্যা হতে পারে"।
নীলম মাথা নিচু করল।
উপমন্যু বললেন "তুমি কালকে বললে জয়িতার সঙ্গে তোমার খুব বেশি বন্ধুত্ব ছিল না, অথচ তোমাদের মধ্যে এত কম বন্ধুত্ব ছিল যে তোমরা গড়পঞ্চকোট চলে গেলে?"
নীলম একটু চুপ করে থেকে বলল "আমার কিছু করার ছিল না স্যার। জয়িতা এক রাতে এসে খানিকটা জোর করেই আমাকে নিয়ে যেতে চায়। অনীশ বলে একটা ছেলে ওকে খুব ডিস্টার্ব করছিল। ও একা যেতে চায় নি, তাই আমার সাহায্য চায়"।
উপমন্যু বললেন "সেটা আমাকে আগে বললে না কেন?"
নীলম বলল "এসব কথা কী করে বলি স্যার"?
উপমন্যু বললেন "হু। ডিটেলসে বল সেদিন কী হয়েছিল"।

নীলম একটু চুপ করে থেকে বলল "এই বাড়িতে আমি আর জয়িতা এক সঙ্গেই পিজি হিসেবে এসেছিলাম। আমি শুরুতেই কারো সঙ্গে সব কথা খোলাখুলি বলতে পারি না। জয়িতাও যথেষ্ট রিজার্ভ ছিল প্রথম দিকে। দেখা সাক্ষাৎ হলে সামান্য হাসি এবং প্রত্যুত্তরে হাসি ছাড়া আর কিছুই হত না। তবে যেহেতু দুজনেই উত্তরবঙ্গের, তাই খানিকটা নিজেদের প্রয়োজনেই কথা বলতে হত। জয়িতার ছেলে বন্ধুদের সঙ্গে কারোরই আমার খুব বেশি পরিচয় ছিল না বা আমি সেসব জানার জায়গাতেও যাই নি কোন দিন। কলকাতায় আমি খানিকটা একাই ছিলাম, যতদিন না আমার আর রোহিতের সম্পর্কটা শুরু হয়"।
উপমন্যু বললেন "রোহিত? তোমার বিশেষ বন্ধু?"
নীলম উপমন্যুর দিকে সরাসরি তাকিয়ে বলল "হ্যাঁ। আমার বিশেষ বন্ধু। রোহিত মিশ্র। আমার স্কুলের অ্যাকাউন্টান্ট। রোহিত অবাঙালি"।
উপমন্যু বললেন "বেশ। বলে যাও"।

নীলম বলল “মাস তিন চার আগে রোহিত আর আমি এক রবিবারে এক রেস্তোরাঁয় লাঞ্চ করছিলাম। সে সময়ে জয়িতা এক ছেলেকে নিয়ে সেখানে আসে। আমার সঙ্গে ওখানে খুব বেশি কথা হয় নি তবে এ বাড়িতে ফেরার পর রাতের দিকে জয়িতা আমার ঘরে নক করে। আমি অবাক হলেও কিছু বলি নি। জয়িতার মেয়েলি কৌতূহল ছিল বলতে পারেন। কত দিনের প্রেম, ছেলে কী করে ইত্যাদি জানতে চায়। আমিও ওর সঙ্গে আসা ছেলেটির ব্যাপারে জানতে চাই। জয়িতা জানায় সেরকম কেউ নয়, ওরা বন্ধু, এই পর্যন্তই”।

উপমন্যু বললেন “ছেলেটার নাম কী মনে আছে তোমার?”

নীলম একটু ভেবে বলল “মনে পড়ছে না স্যার”।

উপমন্যু মোবাইলটা বের করে একটা ছবি বের করে নীলমের দিকে দেখিয়ে বললেন “এই ছেলেটা?”

নীলম মাথা নাড়ল “না”।

উপমন্যু বললেন “বেশ। বল তার পরে?”

নীলম বলল “এরপরে একটু একটু করে জয়িতা আমার ঘরে আসা শুরু করল। বেশ কিছুদিন পরে আমার কাছে এসে এক অদ্ভুত প্রস্তাব দিল”।

উপমন্যু বললেন “গড়পঞ্চকোট যাবার?”

নীলম উপমন্যুর দিকে তাকিয়ে বলল “হ্যাঁ। আমাকে বলল একটা ছেলে যে নাকি খুবই পাওয়ারফুল, সে জয়িতার সঙ্গে...”

নীলম চুপ করে গেল।

উপমন্যু বললেন “তোমাদের দুজনকে নিয়ে যেতে চাইল যাতে ও ওখান থেকে এসকেপ করতে পারে?”

নীলম মাথা নাড়ল।

উপমন্যু বললেন “রোহিতও রাজি হল ওখানে যেতে? কোন প্রশ্ন করল না?”

নীলম খানিকটা ইতস্তত করে চুপ করে রইল।

উপমন্যু বললেন “আচ্ছা থাক এর উত্তর দিতে হবে না। আমি বুঝে নিলাম দুজনে নিভৃতে থাকতে পারবে এরকম কোন জায়গার খোঁজ আগে থেকেই করছিলে। জয়িতার প্রস্তাব তোমাদের কাছে হাতের চাঁদ হয়ে আসে”।

নীলম এবারেও নীরব রইল।

উপমন্যু বললেন “সেখানে গিয়ে কি তুমিও জানতে পারলে জয়িতা প্রেগন্যান্ট ছিল?”

নীলম বলল “হ্যাঁ”।

“আসতে পারি?”

চায়ের কাপ হাতে দরজায় তমালিকা দাঁড়িয়ে। উপমন্যু বললেন “অবশ্যই। আসুন আসুন। চায়ের আগমন। এ তো ভারি ভাল কথা”।

তমালিকা ঘরের মধ্যে ঢুকে একবার নীলমের দিকে তাকিয়ে উপমন্যুর দিকে তাকিয়ে বললেন “কোন সমস্যা নেই তো?”

উপমন্যু তমালিকাকে বললেন “বসুন প্লিজ। আপনি এলেন ভালই হল”।

তমালিকা নীলমের পাশে বসলেন। বললেন “বলুন”।

উপমন্যু বললেন “আপনি জানতেন জয়িতা প্রেগন্যান্ট ছিল”?

তমালিকা এক মুহূর্তের জন্য চমকে স্বাভাবিক হয়ে বললেন “না।”।

উপমন্যু একটা শ্বাস ছেড়ে বললেন “আপনার সঙ্গে জয়িতার বেশ হৃদ্যতা ছিল শুনেছি”।

তমালিকা বললেন “ছিল। তবে এ ব্যাপারে আমাকে কিছু বলে নি কোন দিন। আমি এটা শুনে বেশ অবাক হলাম বলতে পারেন”।

উপমন্যু চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন “অবাক হবার মতই ব্যাপার। আপনার অফিসের খবর কী ম্যাডাম?”
তমালিকা অবাক হয়ে বললেন “কেন বলুন তো?”
উপমন্যু বললেন “এমনিই জানতে চাইলাম। সৌজন্য বলতে পারেন”।
তমালিকা বললেন “ঠিক আছে। সেরকম কোন সমস্যা নেই আর কী”।
উপমন্যু বললেন “আচ্ছা জয়িতার সম্পর্কে এমন কোন তথ্য আপনাদের কারো মনে পড়ছে যেটা আমাকে বলা প্রয়োজন বলে মনে করেন?”
তমালিকা নীলম মুখ চাওয়া চাউয়ি করল চকিতে। উপমন্যু বললেন “এখনই বলতে হবে বলছি না, তবে ফোন করতে পারবেন। আমি হয়ত কালও আসব এখানে”।
তমালিকা বললেন “হ্যাঁ নিশ্চয়ই”।
উপমন্যু চুপ করে চা খেয়ে যেতে লাগলেন। তার ফোন বেজে উঠল। দেখলেন শংকরবাবু ফোন করছেন। উপমন্যু চায়ের কাপ সামনে রাখা টেবিলের ওপর রেখে ফোনটা ধরলেন “হ্যাঁ বলুন শঙ্করবাবু”।
“আপনি ব্যস্ত আছেন? একটু কথা বলা যাবে?”
“সেরকম কিছু নই। বলতে পারেন”।
“বলছি আজ একবার দেখা হতে পারে অফিসার?”
“শিওর। বলুন কোথায় দেখা করতে চান”।
“আমাদের একটা ক্লাব আছে। নাম শুনেছেন হয়ত। আমি লোকেশনটা আপনার মোবাইলে পাঠাচ্ছি। আপনি এলে ভাল হত”।
“অবশ্যই। আপনি ডেকেছেন আমি যাব না তা কি হয় শংকরবাবু। আমি ঠিক চলে যাব”।
“অনেক ধন্যবাদ অফিসার। রাখছি”।
“শিওর”।
ফোনটা কেটে গেল।
উপমন্যু চিন্তিত মুখে নিজের ফোনের দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

।।সন্ন্যাসী এবং ইঁদুরের উপাখ্যান।।
ঢাকুরিয়ার বাড়ি থেকে বেরিয়ে উপমন্যু গাড়িতে উঠে ড্রাইভারকে বললেন “টালিগঞ্জ চ”।
দেবু ব্যাজার মুখে বলল “বাড়ি যাবেন না?”
উপমন্যু সিগারেট ধরিয়ে বললেন “যাব। আগে টালিগঞ্জ চ”।
উপমন্যুর ফোন বাজছিল। পকেট থেকে ফোন বের করে দেখলেন থেকে তার এইচ ও ডি ফোন করছেন। ফোন ধরলেন “বলুন স্যার”।
“ধাপার মাঠের কেসটার আপডেট কী উপমন্যু?” ওপাশের গলাটা একটু অধৈর্য বুঝলেন উপমন্যু। একটু চুপ করে বললেন “দেখছি স্যার। সময় লাগবে”।
“তুমি একা দেখছ কেন কেসটা? একা প্রবলেম হচ্ছে না?”
উপমন্যু বললেন “আমাকে আর একটা দিন সময় দিন স্যার। আমি পরশু ফার্স্ট আওয়ারে আপনাকে জানিয়ে দেব ঠিক কী কী রিকোয়ারমেন্ট আছে আমার এ ব্যাপারে”।
“ওকে। খুব কমপ্লিকেটেড কী?”
“একটু। খানিকটা ইন্সেপশন গোত্রীয় বলতে পারেন। গল্পের ভেতর গল্প আছে”।
“বাহ বাহ। তবে তো ইন্টারেস্টিং বলতে হয়। নোলানপ্রেমী যখন ইনসেপশন খুঁজে পেয়েছে তবে তো ভাবতে হচ্ছে”।

উপমন্যু হাসলেন “তা খানিকটা। ক্রাইমের প্যাটার্ন চেঞ্জ হচ্ছে স্যার। এখন আমরা আপডেটেড না হতে পারলে আমাদেরই সমস্যা বাড়বে”।
“তা বটে। এখন কোথায় যাচ্ছ?”
“দ্য গ্রেট শঙ্কর মুখোপাধ্যায় ডেকেছেন স্যার। তার সঙ্গেই দেখা করতে যাচ্ছি”।
“শঙ্কর মুখার্জি? এই কেসে?”
“হ্যাঁ। মেয়েটি ওঁর অফিসেই চাকরি করত”।
“ওকে। আশা করব কোন কমপ্লিকেশনশ থাকবে না। থাকলে আমায় জানিও”।
“শিওর স্যার”।
ফোনটা রেখে উপমন্যু জানলার বাইরে তাকালেন। শহরে হালকা ঠান্ডা আছে। একটা হাফ হাতা সোয়েটার নিয়ে বেরোলে ভাল হত মনে হচ্ছিল তার।
টালিগঞ্জের ক্লাবে পৌঁছলেন যখন রাত সাড়ে আটটা বাজে। ক্লাবে ঢুকতে উপমন্যুর বিশেষ সমস্যা হল না। অত্যন্ত পশ ক্লাব। শঙ্করবাবু উপমন্যুকে নিয়ে একটা আলাদা ঘরে প্রবেশ করলেন। ঘরে আলো কম, এই শীতেও ঘরের তাপমাত্রা হীমশীতল করে রাখা হয়েছে।
শঙ্করবাবু বসে বললেন “স্কচ চলে তো অফিসার?”
উপমন্যু মাথা নাড়লেন। বললেন “নাহ। আজকাল খাই না। লিপিড প্রোফাইল বিপদ সংকেতের ওপর দিয়ে বইছে”।
শঙ্করবাবু বললেন “বেশ, তবে কফি তো নিন”।
উপমন্যু বললেন “তা চলতে পারে”।
শঙ্করবাবু হাতের ইশারা করলেন। একজন শঙ্করবাবুর কাছে এসে মাথা নিচু করল। শঙ্করবাবু কফির কথা বলে দিলেন তাকে। ছেলেটি বেরিয়ে গেলে শঙ্করবাবু বললেন “কাল আমাকে দিন পাঁচেকের জন্য প্যারিস যেতে হচ্ছে। অনেকভাবেই চেষ্টা করলাম যাওয়াটা আটকাতে কিন্তু শেষ পর্যন্ত আটকানো গেল না”।
উপমন্যু বললেন “নো প্রবলেম। সাবধানে ঘুরে আসুন”।
ঘরে মৃদু শব্দে একটা ইংরেজি গান বাজছে। উপমন্যু গানটা কোথাও শুনেছেন মনে করার চেষ্টা করছিলেন কিন্তু কিছুতেই মনে আসছিল না গানটা। শঙ্করবাবু কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বললেন “মানুষ জীবনে অনেক কিছু চায়। কিন্তু পায় না জানেন তো। ধরুন, যেরকমভাবে সন্তানকে মানুষ করতে চায় একজন অভিভাবক, যদি দেখা যায় সব কিছুর পাল্লায় পড়ে সেই নিজের সন্তানকেই ঠিক করে মানুষ করা গেল না, তখন নিজের শত ঐশ্বর্য থাকলেও দিনের শেষে জিতে যাওয়ার ফিলিংটা আসে না অফিসার”।
শঙ্কর থামলেন। উপমন্যু বুঝতে পারছিলেন শঙ্কর বেশ খানিকটা আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছেন। সামনে থাকা মদের গ্লাসের জন্যই সম্ভবত। উপমন্যু কিছু বললেন না। শুনে যেতে লাগলেন। শঙ্কর বললেন “ছেলেটা যখন ছোট, ওকে কার্শিয়ং এর একটা স্কুলে ভর্তি করালাম। রেখে চলে আসার দিন এত মন খারাপ হল যে ওকে আবার নিয়ে চলে এলাম। ভাবলাম ছেলেই যদি দূরে চলে গেল তাহলে আর কী হল! মা মরা ছেলে, নিজে বিয়ে পর্যন্ত করলাম না কোন দিন আর”।
কফি এসে গেছিল। উপমন্যুকে কফির কাপ এগিয়ে দিলেন শঙ্কর।
উপমন্যু কফিতে চুমুক দিলেন।
শঙ্কর হতাশ গলায় বললেন “টুয়েলভ পাশ করার পর লন্ডনে পড়াতে পাঠাবার ব্যাপারে সব ঠিক করলাম। নিজেই কেঁদে কেটে গেল না। শেষ মেশ আবার কলকাতায় ভর্তি করালাম। এখন শুনছি এখানে এসব ফুল ফুটিয়ে বসে আছে”।
মাথা নাড়তে নাড়তে শঙ্কর সামনে রাখা স্কচের গ্লাসটা এক চুমুকে খালি করে দিলেন। উপমন্যু বললেন “আপনি এখনই এত হতাশ হচ্ছেন কেন শঙ্করবাবু? তদন্ত চলছে এখন। হতে পারে আপনার ছেলে

নির্দোষ"।
শঙ্কর বললেন "আপনি বুঝতে পারছেন না অফিসার আমার সমস্যাটা। আমি ভাবতেই পারছি না যে আমার ছেলে এসবে জড়িয়ে পড়েছে"।
উপমন্যু বললেন "বুঝতে পারছি খানিকটা..."
শঙ্কর বললেন "আমি জানি না আপনাকে ঠিক কী বলব... ইউ আর ইন্টেলিজেন্ট এনাফ..."
উপমন্যু বললেন "আপনি প্যারিস ঘুরে আসুন মিস্টার মুখোপাধ্যায়। পরে না হয় এসব নিয়ে চিন্তা করবেন"।
শঙ্কর স্থির চোখে উপমন্যুর দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন "ছেলেটার দিকে একটু নজর রাখবেন অফিসার। ওর জন্য আমি মরেও শান্তি পাব না। সন্ন্যাসী আর ইঁদুরের গল্প জানেন তো আপনি?"
উপমন্যু কৌতূহলী হলেন "মানে? বুঝলাম না"।
শঙ্কর গ্লাসে নিজেই স্কচ ঢালতে ঢালতে বললেন "থাক। পরে না হয় একদিন এক্সপ্লেইন করব আপনাকে"।
উপমন্যু বললেন "আপনার স্ত্রীর বাড়ি কোথায় শঙ্করবাবু?"
শঙ্কর হাসলেন "ইউ আর ইন্টেলিজেন্ট অফিসার। ভেরি ইন্টেলিজেন্ট"।

।।এক দুগুণে দুই।।

বাড়ির পথ ধরেছে দেবুর গাড়ি। জানলার কাঁচ নামিয়ে চিন্তিত মুখে সিগারেট খাচ্ছিলেন উপমন্যু। দেবু বলল "কাল কিন্তু আপনি আবার ঠান্ডা লাগাবেন স্যার। কাঁচটা তুলে দিন"।
উপমন্যু শুনতে পেলেন না যেন কথাটা। দেবু গজগজ করতে লাগল।
রাত সাড়ে দশটা হয়েছে। শহরের রাস্তায় গাড়ির স্রোত কমেছে। রাস্তার দিকে তাকিয়ে উপমন্যু বিড় বিড় করে বললেন "সন্ন্যাসী এবং ইঁদুরের গল্প। সাউন্ডস ইন্টারেস্টিং"।
মোবাইল বের করে নোটপ্যাড খুলে লিখলেন
"নীলম- প্রথমে বলল জয়িতার সঙ্গে খুব বেশি কথা হত না। তখন বলে নি গড়পঞ্চকোটের কথা। পরে জিজ্ঞেস করতে বলল। কেন? নীলমের বয়ফ্রেন্ডের নাম রোহিত মিশ্র। ছেলেটা নীলমের স্কুলের অ্যাকাউন্টান্ট। রোহিতের সঙ্গে কাল কথা বলতে হবে।
শঙ্কর মুখার্জি- ছেলেকে নিয়ে খুশি নন। কোথাও যেন বলতে চাইলেন ছেলে মায়ের মত হয়েছে। কেন? শঙ্কর মুখার্জির স্ত্রীর সম্পর্কে ডিটেলস চাই, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।
অনীশ মুখার্জি- ইয়ং স্কাউন্ড্রেল। ভেবেছে বাবার টাকা থাকলে যা ইচ্ছে করা যায়। গড়পঞ্চকোটে জয়িতার মুখ থেকে জয়িতার প্রেগন্যান্সির কথা শুনে বুঝে উঠতে পারে নি কী করতে হবে। তবে গড়পঞ্চকোটের পরেও জয়িতার চাকরি যায় নি।
আসিফ-রুহি – আসিফকে জয়িতা যেখানে সেখানে জড়িয়ে ধরত, ব্যাপারটা রুহির অপছন্দ ছিল। জয়িতার অ্যাবরশন এদের দুজনের সাহায্যে হয়েছে। কোথায়, কীভাবে হয়েছে? বের করতে হবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।
বিনয়-কৃষ্ণা- জয়িতার রোজগার বিনয়বাবুর দরকার ছিল। কিন্তু মেয়ে সম্পর্কে কি দুজনেই কম প্রোটেক্টিভ ছিলেন? মা বাবা মেয়ের পিজি মালিককে ফোন করে মেয়েকে ট্র্যাক করার চেষ্টা করবে না? এত বিশ্বাস কি করা যায়?? মেয়ে রাত করে ফিরলে দুজনের কারোই কোন আপত্তি ছিল না?
লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট- জয়িতার অনেক বয়ফ্রেন্ড ছিল (?)। শরীর সম্পর্কে ছুতমার্গ ছিল না (?)। কিন্তু জয়িতাকে কে প্রেগন্যান্ট করেছিল? তমালিকা বললেন জয়িতার প্রেগন্যান্সির ব্যাপারে কিছু জানতেন না। বিশ্বাস হল না। হোয়াটস অ্যাপে রুহিকে জাস্ট একবার বলা ছাড়া জয়িতা তার প্রেগন্যান্সির ব্যাপারে কাউকে কিচ্ছু বলে নি। তার মানে কি যে জয়িতাকে প্রেগন্যান্ট করেছিল সে ফেসবুক হোয়াটস অ্যাপ কিছুই ইউজ করত না? মিডল এজড কেউ? বিশ্বজিৎবাবু?"

বিশ্বজিৎবাবুর নামটা লিখে সে দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন উপমন্যু। গাড়ি তার বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। উপমন্যু গাড়ি থেকে নেমে দেবুকে বললেন "কাল সকাল আটটায় আসবি"।
দেবু বলল "ঠিক আছে"।
গাড়ি বেরিয়ে গেল।
উপমন্যু কলিং বেল টিপলেন। তাতান দরজা খুলে রাগী গলায় বলল "বাবা, ক'টা বাজে দেখেছ?"
উপমন্যু হাসলেন "দেখেছি। কী করব বল। এই তো চাকরি"।
তাতান ঠোঁট উলটে বলল "ছাতার চাকরি। কখন ফিরবে কোন ঠিক নেই"।
উপমন্যু বললেন "গীজার চালানো আছে?"
তাতান বলল "হ্যাঁ। দেরী কোর না বেশি। খেয়ে নিও"।
উপমন্যু টাওয়েল নিয়ে বাথরুমে ঢুকলেন। মিনিট দশেক ধরে স্নান করে চেঞ্জ করে বেরিয়ে ডাইনিং টেবিলে বসলেন। পিয়ালী ভাত বাড়ছিলেন। তাকে দেখে গজগজ করতে করতে বললেন "একেকদিন একেকরকম কর। কাল পা না ধুয়েই খেতে বসে পড়ছিলে, আজ আবার দশ মিনিট ধরে স্নান করলে। কী ব্যাপার বল তো? কী হয়েছে?"
উপমন্যু ভাতে হাত দিয়ে বললেন "কী আর হবে। যা হয়। পুরো চাপ চলছে"।
তাতান বাবার পাশে বসে আগ্রহী গলায় বলল "বল বল, কেসটা শুনি"।
পিয়ালী রাগী গলায় বললেন "একদম না। এসব শুনবি তারপরে পরীক্ষায় গোল্লা খাবি। তুমি কিন্তু একদম তাতানকে কিছু বলবে না"।
তাতান বলল "হ্যাঁ, আমার কী? নেটফ্লিক্সে ক্রাইম সিরিজ দেখে নেব। দরকার কী আমার রিয়েল কেস শোনার?"
উপমন্যু হেসে ফেললেন। পিয়ালী বললেন "কী ফ্লিক্স?"
তাতান জিভ কেটে বলল "ও কিছু না। আচ্ছা বাবা, শোন না, বলছি, ফোনটা রিকভার করার পর কী কী জানা গেল?"
উপমন্যু আড় চোখে পিয়ালীর অগ্নিমূর্তি দেখে নিয়ে মেয়েকে বললেন "সেরকম কিছু না। তুই এসব নিয়ে ভাবিস না। দেখছিস না তোর মা কী রেগে যাচ্ছে?"
তাতান বলল "আচ্ছা আচ্ছা। ঠিক আছে। সেরকম কিছু নেই বলছ? আচ্ছা, একটাই ফোন ছিল? আর কোন ফোন ছিল না তো?"
উপমন্যু চমকে উঠলেন। খাওয়া থামিয়ে তাতানের দিকে তাকালেন।
।। পূর্বকথা- সন্ন্যাসী ও ইঁদুরের উপাখ্যান।।
১৯৮৫। এপ্রিল মাস।
রমলাদের বাড়ির গলি সংকীর্ণ। ড্রেনের গন্ধও আছে। রমলাই বলেছিল শনিবার রাতে বাবা মা থাকবেন। তখন কথা বলতে। রাস্তার মুখে একটা ছোট বাচ্চা দাঁড়িয়ে ছিল শঙ্করকে নিয়ে যাওয়ার জন্য।
শঙ্কর বাচ্চাটার পেছন পেছন অনেকটা যাওয়ার পর একটা ছোট বাড়ির দরজার সামনে এসে বাচ্চাটা চলে গেল।
রমলা দরজা খুললেন। বললেন "এসো"।
শঙ্কর বাড়ির ভিতরে ঢুকলেন।
বাড়ি বলতে ছোট একটা ঘর।
শঙ্কর বললেন "বাবা মা কোথায়?"
রমলা বললেন "দুজনেই বেরিয়েছে। এসে পড়বে কিছুক্ষণ পরে। কেন? তোমার অসুবিধে হচ্ছে আমাদের বস্তিতে?"

শঙ্কর হাসলেন “না না, তা কেন? সেসব কিছু না”।
রমলা বললেন “তোমার বাড়ি থেকে এ বিয়ে মানবেন না, বল?”
শঙ্কর বললেন “বিয়েটা তো আমার বাড়ির লোক করবে না। আমি করব। তুমি কেন খামোখা এটা নিয়ে চিন্তা করছ বল তো?”
রমলা শঙ্কিত মুখে বললেন “আমার সত্যিই চিন্তা হয় আমাদের সম্পর্কটা নিয়ে। তুমি বনেদী বাড়ির ছেলে। আমার মত মেয়েকে...”
শঙ্কর বললেন “কেন? তোমার মত মেয়ে আবার কী?” শঙ্কর রমলার হাত ধরে নিজের কাছে টানলেন “দেখো রমা, আমাদের মধ্যে যা আছে সেটা আমাকে বুঝে নিতে দাও”।
রমলা বললেন “কিন্তু আমার যে তোমাকে দেওয়ার মত কিছু নেই”।
শঙ্কর আবেগে ভাসলেন “আমার তোমাকে ছাড়া কিছু প্রয়োজনও নেই যে”।
রমলা কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন এমন সময় বেশ কয়েক জন লোক ঘরে প্রবেশ করল। রমলা শঙ্করকে ছেড়ে দূরে গিয়ে বসলেন। একজন এসে শঙ্করকে সোফা থেকে তুলে কলার চেপে ধরে উত্তেজিত গলায় বলল “এত বড় সাহস। আমাদের বস্তির মেয়েকে ফুসলানো হচ্ছে?”
শঙ্কর অবাক চোখে রমলার দিকে তাকালেন। রমলা কোন কথা না বলে মাথা নিচু করলেন।
শঙ্কর বিস্মিত গলায় বললেন “রমা তুমি কিছু বল। ওদের বল যে আমি তোমার বাবা মার সঙ্গে কথা বলতেই এসেছি”।
রমলা এবারেও নিরুত্তর রইলেন।
রমলার মা কোন কারণ ছাড়াই চিৎকার করে পাড়া মাথায় করলেন। পাড়ার বেশ কিছু মহিলাও এল। ব্যাপারটা এমনভাবে প্রচার হল যেন রমলাকে একা পেয়ে শঙ্কর জোর করে কিছু করতে গেছিলেন।
কিছুক্ষণের মধ্যে বিচার সভা বসল। এলাকার এক নেতাও এল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঠিক হল শঙ্করকে রমলাকে বিয়ে করে নিয়ে যেতে হবে। শঙ্করকে কিছু বলার সুযোগও দেওয়া হল না। পাড়ার কালিমন্দিরে নিয়ে গিয়ে দুজনকে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হল।
বিয়ের পরে একটা ঘরে দুজনকে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে বন্ধ করে দেওয়া হল।
শঙ্কর এতক্ষণ পরে প্রশ্নটা আবার করলেন “এত সব করার কি কোন প্রয়োজন ছিল রমা? আমি তো তোমাকে বিয়ে করব বলে মানসিক প্রস্তুতি নিয়েই নিয়েছিলাম”।
রমলা কেঁদে ফেলে বললেন “বিশ্বাস কর, আমার বাবা মা যখন থেকে শুনেছে আমাদের ব্যাপারটা, এই ফন্দি বের করেছে। আমি অনেক বুঝিয়েও ওদের বোঝাতে পারি নি যে তুমি আমাকে বিয়ে করবে। ওদের ধারণা তুমি আমার সঙ্গে দুদিন ফূর্তি করে আমায় ছেড়ে দেবে। শুধু এই জন্য ওরা তোমাকে ডেকে নিয়ে এই ট্র্যাপটা বানিয়েছিল। আমাকে ক্ষমা করে দিও তুমি। আমার সত্যিই কিছু করার ছিল না”।
শঙ্কর তেতো গলায় বললেন “সে তো বুঝতেই পারছি, ব্যাপারটা কেন করা হল। কিন্তু এতটা বোধ হয় না করলেও চলত। এত নীচ মানসিকতা আমি ভাবতেও পারি নি। যাই হোক রমা, আমি গোটা ব্যাপারটা সামলে নেব আমার বাড়িতে। কিন্তু, তোমাকেও একটা কথা দিতে হবে আমাকে”।
রমলা শঙ্করের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন।
শঙ্কর বললেন “কাল তোমাকে নিয়ে আমি আমার বাড়ি যাব। সব ম্যানেজও করব। কিন্তু তুমি কোন দিন তোমার বাপের বাড়ির কারো সঙ্গে কোন যোগাযোগ করতে পারবে না। বল তুমি রাজি?”
রমলা কোন কিছু না ভেবে শঙ্করের কথার উত্তরে বললেন “রাজি”।
উপমন্যু অ্যালার্ম দিয়ে রেখেছিলেন সাড়ে ছ’টার। উঠে স্নান সেরে তৈরি হয়ে রায়কে ফোন করলেন।
রায় ফোনটার জন্যই যেন অপেক্ষা করছিলেন, ধরে বললেন “বলুন স্যার”।

উপমন্যু বললেন "দেবুকে আটটায় আসতে বলেছি। তুমি ফোর্স নিয়ে তৈরি থেকো। আমি বেরিয়ে ফোন করব"।
রায় বললেন "শিওর স্যার"।
পিয়ালী উঠে পড়েছিলেন।
উপমন্যু বললেন "পাউরুটি আছে?"
পিয়ালী বললেন "হ্যাঁ। টোস্ট করে দেব?"
উপমন্যু বললেন "হ্যাঁ। আরেকটা অমলেটও করে দিও"।
পিয়ালী বললেন "ওকে"।
উপমন্যু নিজের ঘরে ঢুকলেন।
জয়িতার চ্যাট হিস্ট্রির প্রিন্ট আউটগুলো মন দিয়ে কিছুক্ষণ দেখার পরে একটা পকেট ডায়েরীতে বেশ কয়েকটা নাম লিখলেন।
কিছুক্ষণ পরে পিয়ালী ডাকলেন "খেতে এসো"।
উপমন্যু ডায়েরীটা পকেটে ঢুকিয়ে ডাইনিং রুমে এলেন।
পিয়ালী বললেন "তাতান নেক্সট উইকে কলেজ এক্সকারসানে যাবে বলছিল"।
উপমন্যু খেতে খেতে বললেন "কোথায়?"
পিয়ালী বললেন "ব্যান্ডেলে"।
উপমন্যু বললেন "যাক। আমি ট্র্যাক করব"।
পিয়ালী বললেন "সব সময় এভাবে নজর রাখাটা মাঝে মাঝে বাড়াবাড়ি হয়ে যায় না? একটা সময় তো ছেড়ে দিতেই হবে। মেয়ের বিয়ে হলে কী করবে?"
উপমন্যু অমলেট হাত দিয়ে ছিঁড়ে খেতে খেতে বললেন, "বিয়ের পরেও ট্র্যাক করব। কোথায় একটা দেখলাম খবর বেরিয়েছে মেয়েকে মেরেছে বলে জামাইকে পিটিয়েছে মেয়ের বাবা। আমি ওই ধরণের শ্বশুর হতে চাই"।
পিয়ালী হেসে ফেলে বললেন "আর যখন আমরা মরে যাব?"
উপমন্যু বললেন "ভূত হয়ে ঘাড়ে চাপব যে আমাদের মেয়ের কোন ক্ষতি করার চেষ্টা করবে তার"।
পিয়ালী মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন "পারোও বটে"।
উপমন্যু বললেন "পারার কিছু নেই। করতে হবে। সময় সেটা করতে বলছে। কিছু করার নেই আমার"।
পিয়ালী বললেন "নিজের মেয়ের ওপর ভরসা করবে না"?
উপমন্যু বললেন "একশো বার ভরসা করব, কিন্তু কোন কোন সময় আসে যখন ভরসা করলেও মেয়ে সেই জায়গায় থাকে না। আমি তো তোমাকে বললাম এটা সময়ের দাবী। আমার কিছু করার নেই। আমাদের ছোটবেলায় তুমি রেশন আনতে যেতে না? বাজার করতে না? ওই নক্সাল আমলেও আমাদের অ্যাটলিস্ট মেয়েদের নিরাপত্তা নিয়ে আলাদা করে ভাবতে হয় নি। সময় পাল্টেছে জঘন্যভাবে। এখন আমাদের হাতে সবটা নেই। লোকজনের হাতে কাজ নেই, বেকার মানুষের সংখ্যা বাড়ছে, পারভারটেড মানুষজনের সংখ্যা বাড়ছে। এই অবস্থায় কী করে সবটা ওইটুকু মেয়ের ওপর চাপিয়ে দিই বল?"
পিয়ালী শ্বাস ছেড়ে বললেন "আচ্ছা বুঝলাম। একই কথা বার বার বলতে হবে না। বরং নিজে চেষ্টা কর তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে মেয়েটাকে একটু সময় দিতে। এত ন্যাওটা মেয়ে তোমার অথচ সময় দাও কোথায়?"
উপমন্যুর খাওয়া হয়ে গেছিল। টেবিল থেকে উঠে বললেন "তুমি তো জানো এক্ষেত্রে আমার চাকরির জন্য আমি অপারগ। যেদিন রিটায়ার করব, সারাদিন তোমাদের সঙ্গেই তো কাটাব। চিন্তা করছ কেন"?
পিয়ালী বললেন "হু তাহলেই হয়েছে। ওই আশাতেই তো সারাজীবন কাটিয়ে ফেললাম"।
দেবুর গাড়ির হর্ন শোনা গেল।

উপমন্যু ব্যস্ত হয়ে বললেন "দেবু এসে গেছে, আমি বেরলাম"।
পিয়ালী বললেন "সাবধানে যেও। আর পারলে তাড়াতাড়ি ফিরো"।
হাত মুখ ধুয়ে জুতো পরে বেরলেন।
গাড়িতে উঠতে দেবু জিজ্ঞেস করল "কোথায় যাব?"
উপমন্যু বললেন "বড় বাজার চ"।
দেবু অ্যাক্সিলেটরে পা দিল।
উপমন্যু রায়কে ফোন করে বড়বাজারে "দ্য হোপ" ক্লিনিকে আসতে বলে দিলেন।
ঘন্টাখানেক পরেই দ্য হোপ ক্লিনিকের সামনে দুটো গাড়ি এসে দাঁড়াল।
রায়কে নিয়ে উপমন্যু ক্লিনিকের ভেতরে প্রবেশ করলেন।
বেশ কয়েকজন রুগী সকাল থেকেই বসে ছিল।
উপমন্যু রিসেপশনে গিয়ে নিজের পরিচয়পত্র দেখিয়ে বললেন "একটা অ্যাবরশন কেসের হিস্ট্রি জানতে এসেছি"।
রিসেপশনে বসে থাকা মেয়েটির মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। সে বলল "স্যার একটু অপেক্ষা করুন আমি আমাদের স্যারকে পাঠাচ্ছি"।
তারা সোফায় বসলেন। কিছুক্ষণ পরেই এক মাড়োয়াড়ি ভদ্রলোক হন্তদন্ত হয়ে এসে উপমন্যুর সামনে ভয়ার্ত গলায় বললেন "স্যার আমার মনে হয় আপনার কোন ভুল হয়েছে। এই ক্লিনিকে কোন অ্যাবরশন হয় না। উ তো ইল্লিগাল হে স্যার"।
উপমন্যু ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে বললেন "যেটা চাইছি সেটা দিন। নইলে এখানে ঠিক কী কী লিগাল কাজ চলে সেটা নিয়া আমাকে রিপোর্ট নিতে হবে।
ভদ্রলোক দিশেহারা ভঙ্গিতে উপমন্যুর দিকে তাকালেন।
পূর্বকথা- সন্ন্যাসী এবং ইঁদুরের উপাখ্যান

১৯৯৯। বিশ্বকাপ ক্রিকেট চলছে।
নার্সিং হোমে ভিজিটিঙ আওয়ার শুরু হবে একটু পরেই। রমলার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন শঙ্কর। তাদের প্রথম সন্তান হয়েছে বিয়ের চোদ্দ বছর পরে। স্বভাবতই শঙ্করের আনন্দের সীমা নেই।
পাঁচটার সময় ভিজিটিং আওয়ার শুরু হবে, ঘড়িতে চারটে পঁয়তাল্লিশ বাজে। শঙ্কর অধৈর্যের মত বার বার ঘড়ি দেখছিলেন এমন সময় দেখলেন রমলার বাবা মা সহ তিন চারজন হাজির হয়েছেন।
শঙ্করের চোয়াল শক্ত হল। বিয়ের এতদিন পেরিয়ে গেছে তাদের তবু সেদিনের জোর করে বিয়ে দেওয়াটা তিনি এখনও ভুলতে পারে নি।
রমলার মা-ই এগিয়ে এসে তাকে হাসিমুখে বললেন "খবরটা পেয়ে আর বাড়িতে বসে থাকতে পারলাম না বাবা। চলে এলাম"।
শঙ্কর চোখ মুখ শক্ত করে বললেন "আপনাদের এখানে না এলেই ভাল হত"।
রমলার মা দাঁত বের করে বললেন "তা বললে কী হয় বাবা? ছেলে যেমন তোমার হয়েছে, আমাদেরও তো নাতি হয়েছে। নাতির প্রতি আমাদেরও তো দাবী দাওয়া আছে নাকি?"
শঙ্কর দেখলেন নার্সিং হোমের সবাই কৌতূহলী চোখে তাদের দেখছে। তিনি ঠিক করলেন এখানে কোন রকম সীন ক্রিয়েট করবেন না। শুধু নার্সিং হোমের ম্যানেজমেন্টের একজনকে জানালেন রমলার পরিবারের লোকজনকে যেন নার্সিং হোম থেকে বের করে দেওয়া হয়।
কিন্তু কিছুই করা হল না। ওরা জানাল কাউকে এভাবে নার্সিং হোম থেকে তাড়িয়ে দেওয়া যায় না। বেশ রাগ নিয়ে শঙ্কর রমলার সঙ্গে দেখা করতে গেলেন।

রমলাকে কেবিনে দেওয়া হয়েছিল। তাকে দেখে হাসিমুখে বললেন "ছেলেকে দেখলে?"
শঙ্কর গম্ভীর গলায় বললেন "হ্যাঁ দেখেছি। তোমার বাবা মাকে কে খবর দিয়েছে? তুমি?"
রমলা খানিকটা সংকুচিত হয়ে বললেন "হ্যাঁ। পারি নি গো শেষ অবধি। এই খবর কি না দিয়ে পারা যায়?"
শঙ্কর গম্ভীর হয়েই বসে রইলেন। রমলা এক'বছরে স্বামীর ধাত বুঝে গেছিলেন। শঙ্করকে বেশি ঘাটালেন না। শঙ্কর বেশ কিছুক্ষণ বসে থেকে নার্সিং হোম থেকে বেরিয়ে অফিসে গেলেন। অস্ট্রেলিয়ার একটা কোম্পানির সঙ্গে কোলাবরেশনের কথা হচ্ছিল তাদের সঙ্গে মিটিং করলেন অনেক রাত অবধি।
মাঝরাতে বাড়ি এসে স্কচের বোতল নিয়ে বসলেন কিছুক্ষণ। মাথা জ্বলছিল তার। কিছুতেই সেদিনটার কথা ভুলতে পারছিলেন না যেদিন অকারণ ট্র্যাপে ফেলে তাকে বিয়ে করতে বাধ্য করা হচ্ছিল। তার আরও রাগ হচ্ছিল এই ভেবে যে রমলা তার বাপের বাড়ির সঙ্গে তার অনেক বারণ সত্ত্বেও যোগাযোগ রেখেছে।
ছোটবেলায় পড়া সন্ন্যাসী এবং ইঁদুরের গল্প মনে পড়ে গেল শঙ্করের। এক সন্ন্যাসী একটি ইঁদুরকে একটি মেয়েতে রূপান্তরিত করে তাকে কন্যাস্নেহে বড় করে তোলেন। সে কন্যা যখন বিবাহযোগ্যা হয় তখন সন্ন্যাসী কন্যাকে বলেন নিজের জন্য পাত্র খুঁজতে। সব কিছু শেষে সে কন্যার ইঁদুরকেই পছন্দ হয়। সন্ন্যাসী বুঝতে পারেন আসলে যার জন্ম যেখানে, সে সেখানেই নিজেকে খুঁজে পেতে পছন্দ করে।
শঙ্করের বারে বারে মনে হচ্ছিল, আসলে রমলা হলেন সেই ইঁদুর যে সব কিছুর পরেও নিজের শেকড় ভুলতে পারে নি। রাতের সঙ্গে সঙ্গে শঙ্করের এই সন্দেহও দৃঢ় হচ্ছিল যে, হয়ত সেদিন তার জন্য তৈরী করে রাখা ফাঁদে রমলারও সমান হাত ছিল।
পর দিন সকালে তার বাড়িতে একটা ফোন আসল। জানা গেল রাতে কোন এক অজ্ঞাত কারণে তার স্ত্রী শ্রীমতী রমলা মুখোপাধ্যায়ের অতিরিক্ত রক্তপাতজনিত কারণে মৃত্যু হয়েছে। পুরো ব্যাপারটাকে শঙ্কর যথেষ্ট শোকের সঙ্গেই সামলান এবং সব কিছুর শেষে সদ্যোজাত পুত্র অনীশকে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসেন। বাড়ির দারোয়ান চাকরদের পরিষ্কার নির্দেশ দিয়ে দেন, কোন ভাবেই যেন রমলার বাপের বাড়ির লোক তার বাড়িতে প্রবেশ না করতে পারে।
এর মধ্যে একদিন রমলার বাবা সত্যি সত্যিই তাদের বাড়িতে ঢোকার চেষ্টা করেছিলেন। বৃদ্ধকে রীতিমত লাঠিপেটা করে তাদের চত্বর থেকে তাড়ানো হয়।
রমলার মৃত্যুর পরে অনেকেই উঠে পড়ে লাগেন শঙ্করের আবার বিয়ে দেওয়ার জন্য কিন্তু শঙ্কর কোনদিনই সে প্রস্তাবে কখনও রাজি হন নি।
ছেলে এবং অফিস ছাড়া বাকি জীবনটা শঙ্কর আর কোন কিছুর ওপরেই সময় নষ্ট করেন নি।

বাড়িতে সুশান্তবাবু একাই ছিলেন। উপমন্যু বেল টেপার মিনিট দশেক পরে এলেন।
উপমন্যু এবং ইন্সপেক্টর রায়কে দেখে বললেন "ওহ আপনারা? আসুন অফিসার"।
উপমন্যু ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন "অত্যন্ত দুঃখিত সুশান্তবাবু। বুঝতেই পারছেন তদন্তের প্রয়োজনে একটু বিরক্ত করতে হল। আশা করি কিছু মনে করবেন না"।
সুশান্তবাবু বললেন "ছি ছি, কী যে বলেন। এত বড় একটা কান্ড হয়ে গেল, আমাদের দায়ও তো খানিকটা থেকে যায়। আপনি এসব বলে আমাকে লজ্জা দেবেন না"।
উপমন্যু হেসে বললেন "আপনি যথার্থ ভদ্রলোক সুশান্তবাবু। আমরা এসেছি জয়িতার ঘরটা আরো একবার সার্চ করতে"।
সুশান্তবাবু বললেন "নিশ্চয়ই। ঘরটা তো আপনারা সিল করে দিয়ে গেছিলেন। আমি নিচে আছি। কোন প্রয়োজন হলে বলবেন"।
উপমন্যু বললেন "নিশ্চয়ই"।
রায়কে নিয়ে উপমন্যু দোতলায় জয়িতার ঘরের সামনে গেলেন। ইন্সপেক্টর রায় দরজার সিল খুলে দিলেন।

উপমন্যু ঘরের ভেতর ঢুকে আলো জ্বেলে রায়কে বললেন "আমি আশা করব জয়িতার আরেকটি মোবাইলের সূত্র এই ঘরেই কোথাও লুকিয়ে আছে রায়। চলুন শুরু করা যাক"।
রায় বললেন "সারটেনলি"।
ঘরের মশারি এর আগের দিন উপমন্যু গুছিয়ে রেখেছিলেন। খাটের নিচে অজস্র জিনিস। খাটের ওপর এক্সাম প্রিপারেশন বইটা খোলা।
উপমন্যু অস্ফূটে বললেন "এস আর জি ইনফোটেক থেকে বেরনোর শেষ চেষ্টা ছিল?"
রায় বললেন "কিছু বললেন?"
উপমন্যু বললেন "হু। দ্য গার্ল ওয়াজ ট্রাইং টু কুইট হার জব। সম্ভবত দ্যাট বাস্টার্ড অনীশের জ্বালাতনেই"।
রায় বললেন "ওই কি খুন করতে পারে?"
উপমন্যু মাথা নেড়ে বললেন "এখন অবধি কোন কংক্রিট প্রুফ নেই কোন কিছুরই। সন্দেহের ভিত্তিতে কিছু করা সম্ভব না রয়। তার থেকেও বড় কথা এত বড় ইনসিডেন্টে কোন রকম ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাওয়া যায় নি। এটাও একটা আশ্চর্যের ব্যাপার। যাই হোক..."
উপমন্যু বইটা হাতে তুললেন। আনমনে এ পাতা সে পাতা উলটে আবার খাটের ওপর রেখে দিলেন।
রায় খাটের তলায় উকি দিয়ে খানিকক্ষণ দেখেই বেরিয়ে এসে হাঁচি দিয়ে নাকে রুমাল দিয়ে বললেন "এখানে কিচ্ছু নেই"।
উপমন্যু বললেন "ঠিক আছে, আপনি আরেকবার এই ছোট আলমারিটাও দেখুন"।
ঘরের কোণে একটা ছোট স্টিলের আলমারি। রায় সেটা খুললেন। একগাদা জামাকাপড় ডাই করে রাখা। রায় বললেন "মেয়েটা খুব আগোছালো ছিল স্যার"।
উপমন্যু বললেন "হু। সে তো দেখতেই পাচ্ছি। প্লাগে পয়েন্টে একটা মাত্র ফোন চার্জার আছে দেখতে পাচ্ছি। তাহলে কি আর কোন ফোন নেই?"
রায় বললেন "আপনি কি ধরেই নিচ্ছেন দুটো ফোন ছিল মেয়েটার"?
উপমন্যু রায়ের দিকে তাকিয়ে চিন্তিত গলায় বললেন "থাকা তো উচিত ছিল। আজকালকার ছেলেমেয়েদের দুটো করে ফোন...। ওহ... আমি তো ভুলেই গেছিলাম।"
উপমন্যু পকেট থেকে ফোন বের করে বিনয়বাবুকে ফোন করলেন। ফোন বেশ কয়েকবার রিং হবার পর বিনয়বাবু ফোনটা ধরলেন। উপমন্যু বললেন "বিনয়বাবু, আমি আপনাদের সঙ্গে দেখা করে এসেছিলাম। চিনতে পারছেন আশা করি"।
বিনয়বাবু একটু থমকে বললেন "হ্যাঁ অফিসার, বুঝেছি। বলুন"।
উপমন্যু বললেন "আপনার মেয়ের ক'টা ফোন ছিল বিনয়বাবু?"
বিনয়বাবু বললেন "মানে?"
উপমন্যু বললেন "মানে আজকালকার দিনের ছেলেমেয়েদের তো দুটো করে ফোন থাকে আজকাল। তা আপনার মেয়ের কি একটাই ফোন ছিল?"
বিনয়বাবু বললেন "হ্যাঁ। একটাই ছিল। তবে দুটো নাম্বার ছিল"।
উপমন্যু হতাশ হয়ে বললেন "সে দুটো আমাদের কাছে আছে। ঠিক আছে রাখছি"।
ফোনটা কেটে উপমন্যু কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে তাতানকে ফোন করলেন। তাতান ফোন কেটে দিল। উপমন্যু অধৈর্য হয়ে আবার করলেন। এবার তাতান ধরল।
উপমন্যু বিরক্ত গলায় বললেন "কী রে ফোন কেটে দিচ্ছিস কেন"?
তাতান বলল "ক্লাস করছি তো! কী যে কর না তুমি বাবা!"
উপমন্যু লজ্জিত হয়ে বললেন "ওহ সরি সরি। ভুলেই গেছিলাম"।
তাতান বলল "বল বল শিগগির। বেরিয়েছি ক্লাস থেকে। কথা শেষ হলেই আবার ক্লাসে ঢুকব"।

উপমন্যু বললেন "আচ্ছা, একটা ফোনে দুটো সিম আছে তো। মেয়েটার দুটো ফোন ছিল না"।
তাতান বলল "ওহ। এটা বলার জন্য ফোন করলে?"
উপমন্যু অন্যমনস্ক গলায় বললেন "হ্যাঁ। ঠিক আছে। আমার হিসেবগুলো মিলছে না। ঠিক আছে। রাখছি রে এখন। ক্লাসে যা"।
তাতান বলল "বাড়ি ফিরো তাড়াতাড়ি"।
উপমন্যু বললেন "হ্যাঁ হ্যাঁ। যা ক্লাসে"।
ফোন রেখে উপমন্যু হতাশ গলায় রায়কে বললেন "চলুন। আমি বরং অফিস যাই। আরেকটু ভাবি কেসটা নিয়ে। আপনি ঘরটা সিল করে দিন আবার"।
রায় বললেন "ঠিক আছে। চলুন"।
উপমন্যু আরও কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে খাটের ওপর থেকে এক্সাম প্রিপারেশন বইটা নিয়ে বললেন "চলুন, যাওয়া যাক"।
।।ছাই থেকে আলো।।

গাড়িতে ওঠার পর দেবু ব্যাজার মুখে জিজ্ঞেস করল "কোথায় যাবেন?"
উপমন্যু বললেন "অফিস চ। তোর মুখ গোমড়া কেন? খিদে পেয়েছে?"
দেবু বলল "খেয়েছি"।
উপমন্যু বললেন "কোথায় খেলি? চ কোথাও একটা দাঁড়িয়ে খেয়ে নি। আমারও দুপুরে খাওয়া হয় নি"।
দেবু গাড়ি স্টার্ট দিল। ইন্সপেক্টর রায়ের অন্যত্র কাজ ছিল। তিনি চলে গেছিলেন।
রোদের তেজ আছে। উপমন্যু এক্সাম প্রিপারেশন বইটা পড়তে শুরু করলেন। জয়িতার বইতে দাগ দিয়ে দিয়ে পড়ার অভ্যাস ছিল। প্রথম চ্যাপ্টারটা ছোট ছোট অংকের। উপমন্যু কিছুক্ষণের মধ্যে বইয়ের প্রবলেমগুলোয় মগ্ন হলেন। হুশ ফিরল গাড়ি রাস্তার পাশের একটা ছোট হোটেলে থামতে।
দেবু বলল "চলুন, খেয়ে নি"।
উপমন্যু বইটা গাড়িতে রেখে গাড়ি থেকে নামলেন।
হোটেলের ভেতর ঢুকে একটা টেবিলে বসলেন। দেবুকে বললেন "যা খাবি অর্ডার কর"।
দেবু বলল "মাছ ভাত নি। আপনিও তাই খান। বাইরের মাংস খাওয়া ঠিক না। কী সব ভাগাড় টাগাড় শুনছি"।
উপমন্যু হাসলেন "তা ঠিক"।
দুটো কাতলা থালি অর্ডার করলেন উপমন্যু। একটু পরেই খেতে দিল। একটা থালায় ভাত, তার বিভিন্ন খোপে ডাল, তরকারি, আর একটা বাটিতে ছোট এক পিস মাছ। উপমন্যু ডাল দিয়ে ভাত মাখছিলেন। দেবু বলল "আজও কি কালকের মত অত রাত করবেন?"
উপমন্যু বললেন "হতে পারে। ঠিক নেই। কেন বলত?"
দেবু বলল "আজ তাড়াতাড়ি ফিরলে ভাল হত। বাড়িতে বড্ড খ্যাক খ্যাক করে"।
উপমন্যু বললেন "সে তো আমার বাড়িতেও করে। কী করব বল"।
দেবু বলল "তাড়াতাড়ি ফিরলেই পারেন"।
উপমন্যু হাসলেন "এই চাকরিতে কি সে সুযোগ আছে রে? ভাল চাকরি পেয়েও গেলাম না শুধু এই চাকরি করব বলে। সব খানেই অবশ্য এরকমই চাপ থাকে"।
দেবু বলল "আমার মেজো শালা আইটি কোম্পানির গাড়ি চালায়। ওদেরও অনেক রাত অবধি অফিস থাকে"।
উপমন্যু বললেন "তবে? সব খানেই তাই"।

দেবু আরেকবার ভাত নিল। উপমন্যু নিলেন না। হোটেলের কাউন্টারে বসা ভদ্রলোক খবরের কাগজে শব্দছক করছিলেন মন দিয়ে। উপমন্যু সে দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে হঠাৎ উঠে পড়লেন।
দেবু অবাক হয়ে বলল "কী হল? পুরোটা খেয়ে নিন"।
উপমন্যু বললেন "আমার হয়ে গেছে। তুই খেয়ে নে। আমি গাড়িতে গিয়ে বসছি"।
দেবু মাথা নাড়তে নাড়তে বলল "কী যে করেন"।
উপমন্যু তাড়াতাড়ি হাত ধুয়ে খাবারের বিল দিয়ে গাড়ির দরজা খুলে এক্সাম প্রিপারেশন বইটা খুললেন। একের পর এক পাতা উলটে যেতে লাগলেন। শুরুর দিকে প্রতিটা পাতাতেই জয়িতা পেন্সিল দিয়ে বইতে দাগিয়েছে নিজের মত করে উত্তরগুলো। বেশ কয়েকটা পাতা উল্টাবার পর দেখা গেল একটা পাতায় এসে জয়িতা কোন উত্তরের অপশনে দাগ দেয় নি। বরং সে পেজের ওপরে পেন্সিল দিয়ে একটা ফোন নাম্বার লেখা। উপমন্যু আইটির নায়েককে ফোন করলেন। ফোন বেশ কয়েকবার বেজে থেমে গেল।
অধৈর্য হয়ে উপমন্যু সাইবার সেলে ফোন করে জানতে পারলেন নায়েক মন্দারমণি গেছে। ফোনটা রেখে উপমন্যু বললেন "তাই তো। বলেছিল। ভুলে গেছিলাম"।
দেবু হাত ধুয়ে চলে এসেছিল। গাড়িতে উঠে গম্ভীর গলায় বলল "কী যে করেন না। খাওয়ার নষ্ট করা মোটেও ভাল জিনিস না"।
উপমন্যু বললেন "তা ঠিক। অফিস চ দেখি এবার"।
দেবু গাড়ি স্টার্ট দিল।
উপমন্যু চিন্তিত মুখে জানলার বাইরে তাকিয়ে রইলেন। মিনিট দশেক পরে তার ফোন বেজে উঠল। নায়েক। উপমন্যু সঙ্গে সঙ্গে ফোনটা ধরে বললেন 'কী যে কর না, ফোনটা কাছে রাখতে বলেছিলাম না?"
নায়েক বললেন "স্যার এই স্নান সেরে উঠলাম। বলুন, কী হল আবার"।
উপমন্যু বললেন "জাস্ট একটা নাম্বার পেলাম। সেটার ঠিকুজি কুষ্ঠী, ট্র্যাকিং সব দিতে হবে"।
নায়েক অবাক গলায় বললেন "সেটা তো স্যার ডিপার্টমেন্টে দিলেও হত"।
উপমন্যু বললেন "উহু। হাই প্রোফাইল কেস। কোন রিস্ক নিতে পারব না। তোমাকে ছাড়া আমি কাউকে বিশ্বাস করতে পারব না"।
নায়েক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন "ঠিক আছে স্যার। নাম্বারটা এস এম এস করুন। তবে আমার শিওর ডিভোর্স হবে। বউ হেবি খচে যাবে এখানে এসেও কাজ করতে দেখলে"।
উপমন্যু বললেন "ম্যানেজ কর হে। পুরুষদের কাজই হল সারাজীবন ভাল করে ম্যানেজ করে যাওয়া। তোমার কলটা এক্সপেক্ট করছি খুব শিগগিরি। রাখলাম"।
নায়েক বললেন "বাই স্যার"।
ফোন রেখে উপমন্যু বইটা খুলে আবার বইটার প্রবলেম সল্ভ করা শুরু করলেন।
।।ছাই থেকে আলো।।

অফিসে নিজের চেম্বারে এসে উপমন্যু কম্পিউটার খুলে বসলেন।
ঘটনাপ্রবাহ নিজের মত করে লিখতে শুরু করলেন।
টাইপ করার মাঝেই চোখটা ফোনের দিকে চলে যাচ্ছিল। একবার ভাবলেনও নায়েককে ফোন করবেন কিন্তু শেষ মুহূর্তে ফোন থেকে হাত সরিয়ে নিলেন। ব্যস্ত অফিস। প্রত্যেক অফিসারই কোন না কোন কেসে ব্যস্ত আছেন।
বহুকাঙ্খিত ফোনটা এল ঘন্টাখানেক পরে। নায়েকের নাম্বার দেখেই উপমন্যু সঙ্গে সঙ্গে ফোনটা তুলে বললেন "বলো। জানা গেল কার নাম্বার, কী বৃত্তান্ত?"

নায়েক বললেন "হ্যাঁ। এই নম্বরটি রেজিস্টার আছে তন্ময় ভৌমিকের নামে। ডেট অফ বার্থ ১২-৩-১৯৮২। ঠিকানা দমদমের। আপনাকে সম্পূর্ণ ঠিকানাটা আমি মেসেজ করছি"।

উপমন্যু বললেন "কর। নাম্বারটা অফ আছে"?

নায়েক বললেন "হ্যাঁ। অফ আছে"।

উপমন্যু অন্যমনস্কভাবে বললেন "ঠিক আছে। থ্যাঙ্ক ইউ ভাই। নাও এঞ্জয় ইওর হলিডে। আপাতত আর জ্বালাচ্ছি না"।

নায়েক হাসলেন "ঠিক আছে স্যার"।

উপমন্যু বললেন "ঠিকানাটা এস এম এস কর এখনই"।

নায়েক বললেন "শিওর স্যার"।

ফোন রাখার এক মিনিটের মধ্যেই তন্ময় ভৌমিকের পুরো ঠিকানাটা উপমন্যুকে এস এম এস করে দিলেন নায়েক। উপমন্যু এস এম এসটা পাওয়া মাত্র চেয়ার ছেড়ে উঠে ঘর থেকে বেরোলেন। তাকে দেখে তার কলিগ রঙ্গন পালিত চেচিয়ে উঠলেন "কী হে উপমন্যু, তোমার তো খোঁজই নেই। খুব বিজি নাকি?"

উপমন্যু বললেন "তা বটে। পরে কথা বলছি ভাই"।

রঙ্গন বললেন "এইজন্য বলি টিম কর, টিম কর। বসও তেমন। তোমাকে একা ছেড়ে দেন। তুমি বলেই দেন হয়ত"।

উপমন্যু হেসে বললেন "তা বটে। তবে তোমাকে লাগতে পারে এই কেসে। তৈরী থেকো"।

রঙ্গন মাথা নাড়লেন "শিওর বস। অলওয়েজ অ্যাট ইওর সার্ভিস"।

দেবু গাড়িতেই ঘুমাচ্ছিল। উপমন্যু কাঁচে ঠক ঠক করে ওকে তুলে দিয়ে বললেন "ওঠ শিগগিরি। দমদম যাব"।

দেবু ধড়মড় করে উঠে গাড়ির দরজা খুলে দিল। উপমন্যু গাড়িতে উঠতে গাড়ি স্টার্ট দিল। উপমন্যু এস এম এসটা দেখে দেবুকে ঠিকানাটা বলে দিয়ে বললেন "জলদি চালা"।

দেবু উত্তর দিল না। বোঝা যাচ্ছিল দিবানিদ্রা ভঙ্গ হওয়ায় সে বেশ ক্ষুব্ধ হয়েছে। ঘন্টাখানেক লাগল ঠিকানায় পৌঁছতে। বাজারের কাছে পৌঁছে স্থানীয় লোকেদের জিজ্ঞেস করে খানিকটা গিয়ে দেখা গেল একটা সরু গলির মুখে গাড়ি দাঁড় করিয়ে হেঁটে যেতে হবে। উপমন্যু বললেন "তুই এখানেই থাক। আমি দেখে আসছি"।

দেবু বলল "ঠিক আছে"।

গলিটা ধরে আরও মিনিট পাঁচেক হাঁটবার পরে নায়েকের পাঠানো ঠিকানায় পৌঁছলেন উপমন্যু। একটা ছোট একতলা বাড়ি। বাড়ির সামনে ছোট বাগান করা। কলিং বেল টেপার মিনিট দুয়েক পরে এক ভদ্রমহিলা এসে দরজা খুলে অবাক চোখে উপমন্যুর দিকে তাকিয়ে বললেন "বলুন কী চাই?"

উপমন্যু বললেন "তন্ময়বাবু আছেন?"

মহিলাটি মাথা নেড়ে বললেন "না। উনি অফিসে এখন। কেন বলুন তো?"

উপমন্যু আই কার্ড বের করে দেখিয়ে বললেন "আমি পুলিশ থেকে আসছি একটা কেসের ব্যাপারে। তন্ময়বাবুর অফিসের ঠিকানা এবং ফোন নাম্বার দেওয়া যাবে? আপনি কি ওঁর স্ত্রী?"

মহিলাটি খানিকটা ভয় পেয়ে বললেন "হ্যাঁ। আমি ওঁর স্ত্রী। কিন্তু আপনি কী বলছেন আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না"।

উপমন্যু হেসে বললেন "সে তো এখনও আমিও কিছু বুঝে উঠতে পারি নি। বোঝার চেষ্টা করছি বলতে পারেন। কোথায় চাকরি করেন আপনার স্বামী? এস আর জি ইনফোটেকে কি?"

মহিলাটি বললেন "না, উনি সরকারি চাকরি করেন। আপাতত সল্টলেকে পোস্টেড আছেন"।

উপমন্যু বললেন "বেশ। দেখুন তো এই মেয়েটিকে চিনতে পারেন কি না"।

উপমন্যু তার ফোনটা এগিয়ে দিলেন। মহিলাটি জয়িতার ছবি দেখে মাথা নাড়িয়ে বললেন "না। আমি একে চিনি না"।
উপমন্যু বললেন "আচ্ছা। আপনি অনুগ্রহ করে তন্ময়বাবুর একটি অ্যাক্টিভ নাম্বার এবং বর্তমান অফিসের ঠিকানাটা আমাকে দিন"।
মহিলাটি বললেন "আমি বলছি আপনি লিখে নিন"।
উপমন্যু বললেন "বেশ। বলুন"।

।।ছাই থেকে আলো?।।
গাড়িতে উঠে উপমন্যু বললেন "সল্টলেক চ"।
দেবু গাড়ি স্টার্ট দিয়ে বলল "এই করি সারাদিন ধরে"।
উপমন্যু ঠিকানার কাগজটা দিয়ে তাকিয়ে ছদ্ম দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন "কী করবি, এই তো জীবন"।
দেবু গোঁজ হয়ে চালাতে চালাতে বলল "আমার কিন্তু আজকে তাড়াতাড়ি বাড়ি যেতে হবে"।
উপমন্যু বললেন "ছেড়ে দেব তো। চিন্তা করিস না। দাঁড়া একটা ফোন করে নি"।
কাগজে দেওয়া নাম্বারটা ডায়াল করলেন উপমন্যু। বেশ কয়েকবার রিং হবার পর ওপ্রান্ত থেকে ভেসে এল "আরে মশাই বললাম তো আমার ক্রেডিট কার্ড লাগবে না। দেওয়ার সময় তো দিয়ে দেবেন, তার পরে বিল দিতে একদিন দেরী হলে প্যান্ট হলুদ করে দেবেন। রাখুন তো"।
ফোনটা কেটে গেল।
উপমন্যু হতভম্ব গলায় বললেন "যাব্বাবা"।
নাম্বারটা আবার ডায়াল করলেন। এবার একবার রিং হতেই ওপ্রান্তে ধরলেন তন্ময়বাবু "কী হল? আবার জ্বালাচ্ছেন কেন? বললাম তো আমার চাই না ক্রেডিট কার্ড"।
উপমন্যু একটু গলা খাকরিয়ে বললেন "তন্ময় ভৌমিক বলছেন? আমি কলকাতা পুলিশ থেকে বলছি"।
"অ্যা?" ওপ্রান্তে যেন একটা ইলেকট্রিক শক খেলেন ভদ্রলোক, "পুলিশ? কেন? কী করলাম বলুন তো আমি?"
"আজ্ঞে একটা কেসের ব্যাপারে আপনার সঙ্গে একটু বসতে হত। আপনার বাড়িতে এসেছিলাম, আপনার স্ত্রীর থেকে আপনার অফিসের ঠিকানা পেয়েছি। আপনি এখন অফিসে আছেন?" উপমন্যু নম্র গলায় জিজ্ঞেস করলেন।
"বাড়িতে? জানতামই তো। ঘরশত্রু বিভীষণ বউ থাকতে আর চিন্তার কী আছে"। মনে মনেই বলতে চেয়েছিলেন তন্ময়বাবু কিন্তু কথাটা এদিকেও চলে এল।
উপমন্যু বললেন "আপনার সঙ্গে কথা বলাটা জরুরি তন্ময়বাবু। আমরা একটা কেসের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা জায়গায় আছি এখন"।
তন্ময়বাবু বললেন "বেশ। অফিস অ্যাড্রেস যখন পেয়েই গেছেন তখন চলে আসুন। এখানেই কথা বলে নেব। পাঁচটার আগে আসবেন কিন্তু। তারপরে আমি থাকি না"।
উপমন্যু বললেন "থ্যাংক্স। আমি এখনই আসছি। চিন্তা করবেন না"।
ফোনটা কাটলেন উপমন্যু।
#
তন্ময় ভৌমিক মধ্য চল্লিশ, ছোটখাটো ফরসা চেহারার লোক। উপমন্যুকে অফিসের একটা ছোট ঘরে নিয়ে গিয়ে বললেন "বলুন"।
উপমন্যু আই কার্ড বের করে টেবিলে রাখলেন। তন্ময় ভৌমিক কার্ডটা তুলে দেখে বললেন "ওরে বাবা। গোয়েন্দা পুলিশ। পুলিশে ছুলে কত ঘা যেন?"

উপমন্যু পকেট থেকে ফোন বের করে জয়িতার ছবি বের করে তন্ময় ভৌমিকের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন "চেনেন এই মেয়েটাকে?"
তন্ময় ভৌমিকের চোখে পাওয়ার আছে। পকেট থেকে চশমা বের করে অনেকক্ষণ জয়িতার ফটো দেখে বললেন "নাহ। কে ইনি?"
উপমন্যু তন্ময়ের চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন "সত্যি বলছেন তো? পুলিশ কিন্তু খুব বাজে জিনিস তন্ময়বাবু"।
তন্ময় বললেন "পুলিশ কী জিনিস আমি জানব না? আমার মেজো শালাও পুলিশে আছে। ভোর রাত থেকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে লরি ধরে সংসার চালায়। মাইনের টাকায় হাতও দিতে হয় না। আমাকে পুলিশ নিয়ে আর নতুন কী বলবেন?"
উপমন্যু বহু কষ্টে হাসি চেপে গম্ভীর গলায় বললেন "মেয়েটি খুন হয়েছে তন্ময়বাবু। এবং অত্যন্ত নৃশংসভাবে খুন হয়েছে। মৃত্যুর আগের দিন মেয়েটি একটি বইতে আপনার নাম্বার পেনসিলে লিখে রেখে গেছে"।
তন্ময় অবাক হয়ে বললেন "আমার নাম্বার? কোন নাম্বার?"
উপমন্যু নাম্বারটা বললেন তন্ময়কে।
তন্ময় রেগে গিয়ে বললেন "দূর মশায়। এই নাম্বার আমার কেন হতে যাবে। এটা আমার নাম্বার না। এই নিন, আমার ফোন নিন"... তন্ময় তার ফোন এগিয়ে দিলেন, "এই ফোনে দুটো নাম্বার আছে, আমার অফিসের সবাইকে জিজ্ঞেস করুন, সবাই এক বাক্যে স্বীকার করবে, আমার এই নাম্বার দুটো ছাড়া আর কোন নাম্বার নেই"।
উপমন্যু বললেন "ওকে। আপনার কথা মেনে নিলাম। তাহলে বুঝতে হবে আপনার আধার কার্ড ইউজ করে কেউ সিম তুলেছে। আপনার এই দুটো সিম আপনি কবে থেকে ইউজ করছেন?"
তন্ময় মাথা চুলকে বললেন "একটা তো জিও। আরেকটা বি এস এন এল। বি এস এন এলটা অনেক পুরনো সিম। জিও সিমটা এই ক'মাস আগে..."
তন্ময় থেমে গেলেন।
উপমন্যু বললেন "বলুন"।
তন্ময় বললেন "মাসখানেক না। বছর পেরিয়ে গেছে। কেউ একজন আমার সঙ্গে জিওর দোকানে গেছিল, যে আমার ফিঙ্গার প্রিন্ট দিয়ে একটা সিম তুলেছিল। নামটা ভুলে গেছি বুঝলেন"।
উপমন্যু তন্ময়ের দিকে তাকিয়ে বললেন "ভুলে গেছেন মানে? এসব ব্যাপার কেউ ভোলে নাকি?"
তন্ময় হতাশ গলায় বললেন "আমার মেমোরি খুব খারাপ। আমার বউও জানে। প্রায়ই আলু নিতে বললে আমি পেয়াজ নিয়ে যাই। তারপরে বউয়ের ঝাড় খেতে হয়"।
উপমন্যু তীক্ষ্ণ চোখে তন্ময়কে দেখে বললেন "দেখুন তন্ময়বাবু, হয় আপনি একবারেই কিছু জানেন না, নয়ত আপনি সব জেনে বোকা সাজছেন। ব্যাপারটা এরকম যদি হয় তাহলে কিন্তু আপনাকে হেফাজতে নিতে হবে। সিমটা কাকে দিয়েছিলেন মনে করুন"।
তন্ময় উপমন্যুর দিকে ভীত চোখে তাকিয়ে বললেন "হেফাজত? আচ্ছা, আমাকে একটু সময় দিন"।
উপমন্যু বিরক্ত মুখে তন্ময়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

।।যেখানে দেখিবে ছাই।।

নায়েককে ফোন করছিলেন উপমন্যু। নায়েক ফোন তুলছিলেন না। তন্ময় ভৌমিক চুপ করে উপমন্যুর সামনে বসে আছেন। উপমন্যু ফোনটা কান থেকে নামিয়ে রাখতে তন্ময় বললেন "আমি কি এবার ছুটি পেতে পারি"?

উপমন্যু বললেন “আপনাকে আমি আটকে রাখি নি তন্ময়বাবু। সমস্যা হল, আপনার আধার কার্ড দিয়ে যে নাম্বারটা তোলা হয়েছে সেটা একটা ক্রাইমের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। যদি সেটা হয়ে থাকে, তাহলে বুঝতেই পারছেন আপনি ফেঁসে যেতে পারেন। এখন আপনাকে আমাদের সাহায্য করতে হবে”।

তন্ময় তেরিয়া হয়ে বললেন “আমি তো খুন করি নি। আমি কেন ফেঁসে যাব বলুন তো?”

উপমন্যু বললেন “আপনি খুন করেছেন কি করেন নি সেটা তো এখনই আমি কিছু বলতে পারব না, তাই না। আপনি কী করেছেন সে সম্পর্কেও আমরা এখন পুরোপুরি অন্ধকারে। আমি আবার আপনাকে বলছি, আপনি আমাদের সাহায্য করুন আপনার নিজের স্বার্থে। একটা ছোট মেয়ের স্বার্থেও, যাকে নর্থ বেঙ্গল থেকে কলকাতায় এসে খুন হতে হয়েছে। প্লিজ”।

তন্ময় এবারে খানিকটা শান্ত হলেন। বললেন “বলুন, আমি কীভাবে আপনাকে সাহায্য করব”।

উপমন্যু বললেন “আমি কয়েকজনের ছবি দেখাচ্ছি। আপনি এই ছবিগুলো দেখে আমাকে বলুন এদের কাউকে আপনি চেনেন কি না”।

তন্ময় বললেন “বেশ। দেখান”।

উপমন্যু ফোনের গ্যালারি বের করে তন্ময়ের সামনে দিয়ে বললেন “সোয়াইপ করে যান। যাকে চিনতে পারেন, আমাকে জানান”।

তন্ময় ফোনটা নিয়ে সোয়াইপ করতে শুরু করলেন। প্রথমেই এল শঙ্করবাবুর ফটো। তন্ময় বললেন “ইনি তো বিখ্যাত লোক মশাই। ইনি খুন করেছেন নাকি?”

উপমন্যু মাথা নাড়লেন “না না, তা কেন হবে? আপনি কি একে ব্যক্তিগতভাবে চেনেন?”

তন্ময় দাঁত বের করে হেসে বললেন “খেপেছেন মশাই, ছাপোষা মানুষ। শঙ্করবাবুকে চিনলে এখানে পড়ে থাকতাম নাকি”।

উপমন্যু বললেন “কেন? আপনি এখানে পড়ে আছেন তাতে খারাপ কী আছে? ভালই তো আছেন। সরকারি চাকরি করছেন, আজকালকার দিনে ক'টা লোক সরকারি চাকরি করেন?”

তন্ময় মুখ বেঁকিয়ে বললেন “সরকারি চাকরি? দূর মশাই, সে তো দীপুদা। দীঘা পুরী দার্জিলিংএর বাইরে যাওয়াই যায় না। বেসরকারি মানেই তো ব্যাংকক। সে তো স্বর্গ শুনেছি, থাই মামণিরা এসে মালিশ টালিশ করে দিয়ে যায়...”

কথার তোড়ে বলে যাচ্ছিলেন তন্ময়, বেশি বকে ফেলছেন বুঝে চুপ করে গেলেন। উপমন্যু বললেন “মালিশ... টালিশ... তো এই শহরেও হয়। করান বুঝি”?

তন্ময় উপমন্যুর দিকে তাকিয়ে বললেন “তার সঙ্গে আপনার কেসের সম্পর্ক আছে কি? আমার টাকা, আমি যা ইচ্ছা করব”।

উপমন্যু হাত তুলে মোবাইলের দিকে দেখিয়ে বললেন “প্লিজ দেখুন, আমায় অন্যত্র যেতে হবে”।

তন্ময় রাগী চোখে উপমন্যুর দিকে তাকিয়ে আঙুল দিয়ে ফটোগুলো তাড়াতাড়ি সোয়াইপ করে দেখে নিয়ে ফোনটা উপমন্যুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন “এদের মধ্যে কাউকেই চিনি না আমি। কারো সঙ্গে আমার কোন আলাপ নেই”।

উপমন্যু ফোনটা নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন “বেশ। আজ তাহলে এটুকুই থাকল। যদি দেখা হওয়ার হয়, তাহলে নিশ্চয়ই হবে”।

তন্ময় বললেন “আপনি কি আমাকে হুমকি দিচ্ছেন? আমার ফ্যামিলিতেও কিন্তু পুলিশের লোক আছেন, বলে দিলাম”।

উপমন্যু তন্ময়ের দিকে ঝুঁকে বললেন “আপনার ফ্যামিলিতে পুলিশের লোক আছেন, কিংবা সিবিআইয়ের লোক আছেন, তাতে আমার কোন যায় আসে না ভৌমিকবাবু। যদি আপনি দোষী হন, তাহলে আপনি

দেশের প্রধানমন্ত্রী হলেও কোমরে দড়ি পরিয়ে জেলে নিয়ে যাবার ক্ষমতা ভারতীয় সংবিধান আমাদের দিয়ে রেখেছে”।

তন্ময় ঘাবড়ে গিয়ে দাঁত বের করে বললেন “এই দেখুন মশাই, খচে যাচ্ছেন কেন? বিশ্বাস করুন, আমি একটা পিপড়েও মারি নি জীবনে, খুন টুন তো দূরের কথা। আপনি বসুন, আমাদের অফিসের ক্যান্টিনের চা খেয়ে যান। অযথা রেগে যাচ্ছেন মশাই”।

উপমন্যু বসলেন। বললেন “বেশ। আপনার কথা বিশ্বাস করলাম। খাওয়ান চা”।

তন্ময় ঘর থেকে বেরিয়ে চা বলে এসে বসে বললেন “লোকজনের হেবি কৌতূহল। সবাই ভাবছে অফিসে পুলিশের গাড়ি কেন এল। এ কেমন ফেঁসে গেলাম বলুন তো মশাই। কোন কুক্ষণে সিম তুলতে যেতাম। সেই যে, খুব লম্বা লাইন পড়ল না? আরে ভুলে গেলেন? সেই যে ফ্রি সিম দিচ্ছিল আধার নাম্বার দিলেই। আমাকেও কে যেন বলল...” তন্ময় বিভ্রান্তের মত মুখ করে উপমন্যুর দিকে তাকালেন।

উপমন্যু বললেন “সিমটা এক বছর বা দেড় বছর আগে তোলা। হতে পারে, আপনার কোন অফিস কলিগের সঙ্গে গিয়ে তুলেছিলেন”।

তন্ময় কয়েক সেকেন্ড উপমন্যুর দিকে তাকিয়ে লাফিয়ে উঠে বললেন “ঠিক বলেছেন মশাই, মনে পড়েছে। অতনু... অতনু। আমি সে সময়টা প্রোজেক্টের কাজে আমাদের বিবাদি বাগের অফিসে ছিলাম। অতনুই তো... হ্যাঁ, স্পষ্ট মনে পড়েছে, অতনু আর আমি চাদনি গিয়ে সিমটা তুলেছিলাম”।

উপমন্যু নড়ে চড়ে বসলেন “অতনু? অতনু কী? নাম ধাম যা জানেন বলুন”।

চা এসে গেছিল। তার সঙ্গে লম্বা বিস্কুট।

উপমন্যু চা টেবিলে রাখলেন। ক্যান্টিনের ছেলেটা অনেক প্রশ্ন নিয়ে উপমন্যুর দিকে তাকাচ্ছিল।

তন্ময় ক্যান্টিনের ছেলেটাকে ধমক দিয়ে বললেন “তুই যা এখন। পরে কথা বলব”।

ছেলেটা বেরোলে তন্ময় ঘরটার দরজা ভেজিয়ে দিয়ে চেয়ারে বসে বললেন “দাদা, আমার নাম যেন না ওঠে। অতনু ভটচাজ একটি চিজ”।

উপমন্যু বললেন “মানে?”

তন্ময় আবার ভাল করে দরজার দিকে তাকিয়ে একটু উশখুশ করে বললেন “এই যে মালিশ টালিশের কথা বলছিলেন না, সেটা অতনুর পাল্লায় পড়ে একবার করিয়েছিলাম। বালিগঞ্জে একটা সালোন না কী বলে সেসব আছে মশাই। বাইরে থেকে দেখলে কিস্যু বুঝবেন না। ভেতরে গিয়ে কন্ট্র্যাক্ট হল। সে এক এক্সপেরিয়েন্স। কীসব ক্রিম টিম দিয়ে নাঙ্গা মেয়ে বডি মালিশ করে দেয়, তারপর...”

তন্ময় কাশতে কাশতে চুপ করে গেলেন।

উপমন্যু বললেন “হু বুঝলাম। এই অতনুর ডিটেলসটা দিন তবে। কোথায় আছেন এই চিজটি?”

তন্ময় বললেন “এখন হাওড়ার অফিসে আছে। ইউনিয়নে চেনা পরিচিত আছে তাই নিজের ভাল পোস্টিং করিয়েছে আর কী”।

উপমন্যু বললেন “হু, আর বাড়ির ঠিকানা?”

তন্ময় বললেন “ওই তো, হাওড়াতেই ওর বাড়ি। শিবপুরে”।

উপমন্যু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন “দেবুরে। হল তোর আজ।” তন্ময়ের দিকে তাকিয়ে বললেন “দিন, অতনুর ফোন নাম্বার”।

দেবু বিড়ি খাচ্ছিল। উপমন্যুকে দেখে বিড়ি ফেলে দিল। উপমন্যু দেবুর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে বললেন “তুই একটা কাজ কর, তুই বাড়ি চলে যা। আমি ক্যাব নিয়ে নিচ্ছি”।

দেবু বলল “কেন কোথায় যাবেন?”

উপমন্যু বলল “শিবপুর যেতে হবে। ফিরতে যথারীতি রাত হতে পারে। তুই বাড়ি চলে যা”।

দেবু গাড়িতে উঠে বলল “বসুন”।
উপমন্যু অবাক হয়ে বললেন “মানে?”
দেবু গম্ভীর গলায় বলল “আগে ডিউটি। কাজের মাঝখান থেকে আমি পালাই না”।
উপমন্যু অনেক কষ্টে হাসি চেপে গাড়িতে উঠলেন।
দেবু গাড়ি স্টার্ট দিল। উপমন্যুর ফোন বাজছিল। দেখলেন বিল্টু ফোন করছে।
উপমন্যু বললেন “বল বিল্টু”।
বিল্টু বলল “স্যার, দেখা হবে নাকি?”
উপমন্যু বললেন “হতেই পারে। কোথায় তুমি?”
বিল্টু বলল “আমি বেলেঘাটার কাছে আছি স্যার”।
উপমন্যু বললেন “বাহ, ভালই হল, আমি হাওড়া যাচ্ছি এখন। তুমি ওদিকেই থাকো। গাড়িতে তুলে নিচ্ছি”।
বিল্টু বলল “ঠিক আছে স্যার”।
কিছুক্ষণের মধ্যেই বিল্টু গাড়িতে উঠল। বিল্টু পুলিশের ইনফরমার। ছোট খাটো চেহারা। এককালে প্রচুর বাজে কাজ করেছে। উপমন্যুই বিল্টুর মগজধোলাই করে ওকে সৎপথে আনেন। এখন শোলার ব্যবসায়ী। তবে উপমন্যু যে কোন কাজ দিলে নিষ্ঠা সহকারে করে।
গাড়িতে উঠে বিল্টু বলল “কলকাতায় কি ঠান্ডা পড়ে না স্যার? আমাদের হুগলীতে হেবি ঠান্ডা”।
উপমন্যু বললেন “পলিউশন বাড়ছে বলেই হয়ত। যাক গে, কাজের কথায় আসি। কী আপডেট বল”।
বিল্টু মোবাইল বের করে বলল “এই হালদার বাড়ির মালিক যিনি, মানে বয়স্ক লোক যে ভদ্রলোক, সুশান্ত হালদার, তিনি বাড়ি থেকে বেরোন না। পাড়ার লোকেদের থেকে শুনে বুঝলাম নিতান্ত ভদ্রলোক। কারো সাতে পাঁচে থাকেন না। আছেন, ওই অবধি। সুশান্ত বাবুর বড় ছেলে এখানে থাকে না। ছোট ছেলে থাকে। বিশ্বজিৎ আর ওর স্ত্রী। বিশ্বজিৎবাবু ভোকাল লোক। পাড়ার পুজোর মিটিংএ বাওয়াল টাওয়াল দেন... সরি স্যার, বাজে কথা বেরিয়ে গেল”।
উপমন্যু বললেন “আহ, তুমি বল না, বাজে কথা বেরোলে বেরোবে”।
বিল্টু খুশি হয়ে বলল “থ্যাঙ্কু স্যার। যা বলছিলাম, এই বিশ্বজিৎবাবু ভোকাল লোক। তবে চাউনি ভাল না”।
উপমন্যু বললেন “চাউনি ভাল না মানে?”
বিল্টু বলল “দেখুন না স্যার, বর বউ একসঙ্গেই অফিস যায়। কিন্তু বাসে টাসে কোন মেয়েকে দেখার চোখ তো দেখলাম, একেবারেই ভাল না”।
উপমন্যু বললেন “সে তুমি আর কী করবে। এই সিনড্রোমে অনেকেই ভোগে। ওসব কোন কাজের কথা না। কাজের কোন কথা থাকলে বল। নীলমের সম্পর্কে কিছু খবর পেলে?”
বিল্টু মাথা নেড়ে বলল “সেরকম কিছু না স্যার। এই দুদিনে কী আর হয়। আরো সময় লাগবে”।
উপমন্যু হতাশ হয়ে বললেন “তাহলে আর দেখা করলে কেন? সেরকম কোন ব্রেকিং নিউজ তো দিতে পারলে না”।
বিল্টু বলল “ব্রেকিং নিউজ স্যার জীবিত কারো সম্পর্কে দেওয়ার নেই”।
উপমন্যু বললেন “মানে? জয়িতার সম্পর্কে দেবে?”
বিল্টু বলল “হ্যাঁ স্যার। সে মেয়ের সম্পর্কেই। মেয়েটা অনেক রাত করে ঘরে ফিরত। পাড়ার লোকেদের কাছে মেয়েটার ইমেজ হেবি খারাপ। অনেকের ধারণা মেয়েটা... ইয়ে মানে কলগার্ল ছিল। আর খুব ডেসপারেট মেয়ে ছিল স্যার। পাড়ার দোকান থেকে একদিন নাকি কন্ডোম কিনেছিল”।
উপমন্যু বললেন “সে তো ভাল ব্যাপার। ছেলেরাই সব সময় কন্ডোম কিনবে এ কথা কোথায় লেখা আছে। যাক গে, বল তারপর”।

বিল্টু বলল "ও মেয়ের পাড়াতেও দিওয়ানা ছিল। কিন্তু কাউকে পাত্তা দিত না। সোজা বাড়িতে গিয়ে ঢুকত। তবে পাড়ার ছেলেপিলে ওই ঝাড়ি অবধিই আটকে ছিল। তার বেশি কোন দিন কিছু করে নি"।
উপমন্যু বললেন "আচ্ছা। আর?"
বিল্টু বলল "কালীপুজোর রাতে মেয়েটার সঙ্গে একটা ছেলের খুব ঝগড়া হয়েছিল। ছেলেটা বাইক নিয়ে মেয়েটাকে দিতে এসেছিল। পাড়ার মোড়েই মেয়েটা বাইক থেকে নেমে গিয়ে গালাগাল দিতে বাড়ি ফিরেছিল। এটা পাড়ার মোড়ের পানের দোকানের নিউজ"।
উপমন্যু বললেন "হু। বুঝেছি। নজর রাখো। খবর নিতে থাকো। তুমি এখন কোথায় যাবে?"
বিল্টু বলল "আপনি হাওড়া যাচ্ছেন না? আমায় ছেড়ে দিন। আমি ঢাকুরিয়া চলে যাই। একটা ডেরা জুটিয়েছি ক'দিনের জন্য"।
উপমন্যু পকেট থেকে পাঁচশো টাকা বের করে বিল্টুকে দিয়ে বললেন "এ নাও। পরে তোমার পেমেন্টের ব্যবস্থা করে দেব। দেবু, গাড়িটা বাঁ দিক করে দাঁড় করা"।
।।অন্ধকারের পরে।।

বাড়িটার নাম্বার দেখে যখন দরজায় নক করলেন উপমন্যু তখন সন্ধ্যে সাতটা বাজে। কন্ট্রোল রুমে ফোন করে অতনুর ফোন নাম্বার থেকে বাড়ির ঠিকানা নিয়ে সরাসরি চলে এসেছেন। আগে থেকে ফোন করলে সতর্ক হয়ে যেতে পারে ভেবে উপমন্যু ফোনও করেন নি।
পাড়ার লোককে বাড়ির নাম্বার আর অতনুর নাম বলতেই বাড়িটা দেখিয়ে দিল। মিনিট দুয়েক অপেক্ষা করার পর এক ভদ্রমহিলা দরজা খুলে তার দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন।
উপমন্যু হাত জোড় করে বললেন "নমস্কার বউদি আমি অতনুর অফিস থেকে আসছি, উনি বাড়িতে আছেন?"
ভদ্রমহিলা খানিকটা হতচকিত হয়ে বললেন "এই মাত্র ফিরেছেন। আপনি আসুন। আমি ওকে ডাকছি"।
একটা ছোট ড্রয়িংরুম। ভদ্রমহিলা উপমন্যুকে বসিয়ে ঘরের ভিতর যাওয়ার প্রায় সঙ্গেই সঙ্গেই একটা বছর পাঁচেকের বাচ্চা ছেলে এসে উপমন্যুকে নিবিষ্ট মনে দেখতে লাগল। উপমন্যু বললেন "তোমার নাম কী?"
ছেলেটা বলল "দেবতনু ভট্টাচাজ্জ। তোমার কী নাম?"
উপমন্যু নাম বলার আগেই পরদা ঠেলে ঘরের ভেতর প্রবেশ করলেন অতনু ভট্টাচার্য। উপমন্যুর দিকে তাকিয়ে বললেন "কে আপনি? অফিস থেকে এসেছেন বলল রীমা!"
উপমন্যু পকেট থেকে তার আই কার্ডটা বের করে অতনুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন "ওই পি এফ সংক্রান্ত ব্যাপার আর কী। এখানেই বলবেন না রাস্তায় যাবেন?"
অতনু বিস্ফারিত চোখে তার কার্ডের দিকে তাকিয়ে বললেন "এক মিনিট। আমি জামা পালটে আসছি"।
উপমন্যু অতনুর ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন "তুমি স্কুলে যাও তো?"
দেবতনু মাথা একপাশে হেলিয়ে দিয়ে বলল "হ্যাঁ। তুমি স্কুলে যাও?"
উপমন্যুও দেবতনুর মাথা একপাশে হেলিয়ে দিয়ে বললেন "হ্যাঁ। আমিও যাই"।
দেবতনু উপমন্যুর সঙ্গে আরও গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা বলার প্রস্তুতি নিচ্ছিল এমন সময় অতনু ঘর থেকে তৈরী হয়ে বেরিয়ে বললেন "চলুন। বাইরে গিয়ে কথা বলি"। ঘরের ভেতরে গলা তুলে বললেন "বাবুকে নাও তো"।
অতনুর স্ত্রী এসে ছেলেকে কোলে নিয়ে অতনুকে বললেন "কোথায় যাচ্ছ? চা করব?"
অতনু চোরাচোখে উপমন্যুর দিকে একবার তাকিয়েই স্ত্রীর দিকে তাকালেন "না, আমি আসছি এখনই। দরজাটা বন্ধ করে দাও। আসুন"।

অতনুর স্ত্রীর বিস্মিত চোখের সামনে দিয়ে দুজনে বেরিয়ে রাস্তায় আসলেন। উপমন্যু বললেন “চলুন, আমার গাড়িতেই বসি”।
অতনু বললেন “চলুন”।
দেবু গাড়িটা কাছাকাছিই রেখেছিল। উপমন্যু পেছনের সিটে অতনুকে বসতে বলে অতনুর পাশে বসলেন।
উপমন্যু বললেন “বলুন অতনুবাবু, নাম্বারটা অফ করে রেখেছেন কেন?”
অতনু বললেন “মানে?”
উপমন্যু বললেন “দেখুন অতনুবাবু, বুঝতেই পারছেন, পুলিশ মনে করলে ঠিক কী কী করতে পারে। আপনি এবার নিজেই ঠিক করুন কোন পথে চলবেন”।
অতনু বললেন “আমি কিন্তু কিছু বুঝতে পারছি না আপনি কী বলতে চাইছেন”।
উপমন্যু ফোনটা এগিয়ে দিয়ে বললেন “এই নাম্বারটা আপনি ইউজ করছিলেন তো?”
অতনু সেটা দেখে বললেন “নাহ। আমি ইউজ করি নি”।
উপমন্যু বললেন “ওকে। নো প্রবলেম। আপনি ইউজ করেন নি। আচ্ছা, একে চেনেন?”
উপমন্যু জয়িতার ছবি বের করে অতনুকে দেখালেন।
অতনু বললেন “না। কে ইনি?”
উপমন্যু বললেন “এর নাম জয়িতা। কোন এক বরাহ নন্দন একে খুন করেছে। সেই খুনীর খোজেই তল্লাশি চলছে বলতে পারেন”।
অতনু বললেন “ওহ। বেস্ট অফ লাক স্যার। কিন্তু আপনি আমার বাড়ি এলেন কেন বা আমাকে খুঁজতে এলেন কেন এখনও বুঝলাম না বিশ্বাস করুন”।
উপমন্যু একটু চুপ থেকে গাড়ি থেকে গলা বাড়িয়ে দেবুকে বললেন “থানার গাড়িটা কতদূর খবর নে তো”।
দেবুকে আগে থেকেই বলা ছিল উপমন্যু এই কথাটা বললে তাকে কী করতে হবে। সে গাড়ি থেকে হাঁটতে হাঁটতে দূরে চলে গেল।
অতনু বললেন “মানে? থানার গাড়ি মানে?”
উপমন্যু বললেন “কী করব বলুন অতনুবাবু? আপনি তো আমার ভাল কথায় বুঝছেন না। এবার থানায় নিয়ে গিয়ে একটু ইন্টারোগেশন করতেই হবে আপনাকে”।
অতনু গাড়ি থেকে নেমে পালাতে যাচ্ছিলেন উপমন্যু বজ্রমুষ্টিতে অতনুর হাত ধরে বললেন “পালাবার চেষ্টা করে লাভ নেই অতনুবাবু। আমার হাত থেকে পালানো একটু সমস্যা আছে”।
অতনু অস্ফুটে চেচিয়ে উঠলেন “আমাকে ছেড়ে দিন স্যা্র আমি কিছু করি নি”।

।।অন্ধকারের পরে।।

দরজা খুলল তাতান। উপমন্যু ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন “জলদি গীজারটা চালা”।
তাতান বলল “বাবা, আজই তোমাকে তাড়াতাড়ি আসতে বলেছিলাম। বারোটা বাজালে আজ?”
উপমন্যু টুলের উপর বসে জুতো খুলছিলেন। বললেন “আর কী করবি? চাকরিটাই এমন”।
তাতান গীজার চালিয়ে বলল “খাবার গরম করে দি? মা ঘুমিয়ে পড়েছে”।
উপমন্যু বললেন “কর। আমি ফ্রেশ হয়ে আসছি”।
বাথরুমে ঢুকে পড়লেন উপমন্যু। মিনিট দশেক পর চেঞ্জ করে বেরিয়ে ডাইনিং টেবিলে বসলেন। তাতান ভাত বেড়ে রেখেছিল। উপমন্যু খেতে শুরু করলে বলল “মা তোমাকে বলেছে তো কলেজ এক্সকারসানের ব্যাপারটা?”
উপমন্যু বললেন “হ্যাঁ। যাবি। নো ইস্যু”।

তাতান খুশিতে উজ্জ্বল হল একটু।
উপমন্যু হালকা গলায় বললেন "বয়ফ্রেন্ড জুটিয়েছিস নাকি?"
তাতান থতমত খেল। পরক্ষণেই রেগে গেল "এ কেমন প্রশ্ন বাবা?"
উপমন্যু বললেন "এমনি জানতে চাইছি। তোদের বয়সে তো এগুলো স্বাভাবিক"।
তাতান বলল "না। আমার খেয়ে দেয়ে কাজ নেই। কোন ইচ্ছা নেই লাইফটা এত তাড়াতাড়ি বরবাদ করার"।
উপমন্যু মেয়ের দিকে তাকিয়ে হাসলেন।
তাতান বলল "কী ব্যাপার বল তো? কী হয়েছে?"
উপমন্যু বললেন "অকুপেশনাল হ্যাজার্ড"।
তাতান বলল "মানে?"
উপমন্যু বললেন "একটা মানুষকেও বিশ্বাস হচ্ছে না আজকাল। ঘরে এসেও তার রেশ থেকে যাচ্ছে আর কী। এটাকেই বলে অকুপেশনাল হ্যাজার্ড। আমার ক্ষেত্রে এটা সাইকোলজিকাল হচ্ছে"।
তাতান বলল "ওহ। তার মানে তুমি আমাকে বিশ্বাস করছ না, তাই তো?"
উপমন্যু বললেন "অবচেতন মনে নাও করতে পারি। এমনি করছি এখন"।
তাতান চোখ মুখ শক্ত করে বলল "কেন বিশ্বাস না করার কী আছে? তোমার মাঝে মাঝে কী হয় বল তো বাবা? এরকম ডিপার্টমেন্টে আছো কেন যেখানে মানুষকে বিশ্বাস করতে পারো না?"
উপমন্যু মাছের ঝোল দিয়ে ভাত মাখতে মাখতে হাসলেন "তুই কিন্তু একদম তোর মার মত কথা বলছিস তাতান"।
তাতান বলল "কেন বলব না বাবা? আমি সব সময় তোমার পক্ষ নিয়ে কথা বলি। সেই তুমিও যদি আমাকে বিশ্বাস না কর তাহলে কী করে হবে?"
উপমন্যু খাওয়া থামিয়ে তাতানের দিকে তাকিয়ে বললেন "কী জানিস তো, এই পৃথিবীটা আর আগের মত নেই। মানুষ হয়ত রক্ত মাংসের আছে, কিন্তু তবু বহু চেঞ্জ হয়ে গেছে। বহু। এখন আর সব কিছু সেই সরলরেখায় চলছে, এটা ভাবতে পারা যাচ্ছে না"।
তাতান বলল "কী হয়েছে বল। খুব কমপ্লিকেটেড কেস?"
উপমন্যু বললেন "আমরা যারা এই সব লাইনে আছি, আসলে আমাদের সোজা চিন্তা ভাবনাটাই নষ্ট হয়ে যায়। কিছু করার নেই আসলে"।
তাতান বলল "আহ, কী হয়েছে বল না?"
উপমন্যুর ভাতটুকু খেয়ে উঠে পড়ে থালাটা রান্নাঘরের সিংকে রেখে বললেন "সেসব তোর জেনে কাজ নেই। তুই ঘুমিয়ে পড়। এত রাত অবধি জাগতে হবে না"।
তাতান বলল "তাহলে এরকম বিপিতৃসুলভ কথা বলবে না বল কোন দিন"?
উপমন্যু হেসে ফেললেন "এসব ভাষা কোত্থেকে শিখছিস?"
তাতান বলল "বিমাতৃসুলভ হলে বিপিতৃও হতে পারে। শেখার কিছু নেই। তুমি যা শুরু করছ তাতে এসব ভাষা স্পন্টেনিয়াসলি বেরোয়। মা গজগজ করতে করতে ঘুমিয়েই পড়ল। বলে কাশীবাসী হবে"।
উপমন্যু বলল "ভাল তো। মাকে নিয়ে কাশী ঘুরে আয় বরং"।
তাতান বলল "হ্যাঁ, ওই করি। আচ্ছা। আমি ঘুমাতে গেলাম। তুমি আবার রাত জেগো না"।
উপমন্যু বললেন "হ্যাঁ। যা"।
উপমন্যু ঘরে ঢুকে রঙ্গনকে ফোন করলেন। একবার রিং হতেই ফোন ধরলেন রঙ্গন "বল"।
উপমন্যু বললেন "অতনু কী করছে?"
রঙ্গন বললেন "কান্নাকাটি করছে। সংসার আছে, সম্মান আছে এসব করছে"।

উপমন্যু বললেন "বাড়িতে ফোন করিয়েছ?"
রঙ্গন বললেন "হ্যাঁ। কথা বলেছে"।
উপমন্যু বললেন "ওকে। কথা বলেছে যখন তখন ঘরে আটকে রেখে দাও। ফালতু ফুটেজ দিও না। তোমরা রেস্ট নিয়ে নাও। বসের সামনে যখন ব্রিফিংটা দেব তখন অতনুকে দরকার হবে"।
রঙ্গন বললেন "সারটেনলি। কেসটার কিনারা করতে পেরেছ তার মানে?"
উপমন্যু হাসলেন "হোপ সো"।

।।বাঁশি শুনে আর।।
উপমন্যু দেরী করে ঘুম থেকে উঠলেন। প্রায় সাড়ে আটটায়। ফ্রেশ হয়ে ড্রয়িং রুমে গিয়ে দেখলেন তাতান ব্রেকফাস্ট খাচ্ছে। পিয়ালী কাগজ পড়ছিলেন। তাকে দেখে বললেন "কী ব্যাপার? আজ ছুটি নাকি?"
উপমন্যু বললেন "খেপেছ? এখন ছুটি? কেস এখন ক্লাইম্যাক্স ছোঁয় ছোঁয়"।
পিয়ালী বললেন "হ্যাঁগো, তোমাদের মাইনে বাড়বে না? ডি এ পাবে না?"
উপমন্যু কাঁধ ঝাঁকালেন "গড নোজ"।
পিয়ালী বললেন "চালাব কী করে বল তো? এরা কি ধরেই নেয়, পুলিশ ঘুষ খেয়ে সংসার চালাবে?"
উপমন্যু ঠোঁটে আঙুল তুলে বললেন "একদম এসব কথা নয়। এভাবেই চলবে। তুমি কি চাও চাকরিটাও যাক?"
পিয়ালী রেগে গিয়ে বললেন "ঢং! ঘরের ভেতরও বলা যাবে না নাকি? এখানে কে আছে?"
উপমন্যু বললেন "ঘর থেকেই তো অভ্যাসটা তৈরি হয়। ধর, এখানে বলতে বলতেই তুমি বাইরে বললে। এমন কারো কাছে বলে ফেললে যার কানে গেলে আমায় পাঠিয়ে দিল ট্রান্সফার করে সুন্দরবনে। তখন দেখা গেল তুমি ডিঙি নৌকা করে বাজার করতে যাচ্ছো। ভাল লাগবে তখন?"
তাতান হাসতে লাগল। পিয়ালী বললেন "উফ। একটা কথা যদি বলতে দাও"।
উপমন্যুর ফোন বেজে উঠল। পিয়ালী বললেন "ওই দেখো, শ্যামের বাশি বেজে উঠেছে। দেখো আবার কী হল"।
উপমন্যু দেখলেন রঙ্গন ফোন করছেন। ধরলেন "বল রঙ্গন"।
রঙ্গন বললেন "তুমি যাদের কথা বলেছিলে তাদের সবাইকেই পেয়েছি"।
উপমন্যু বললেন "গ্রেট। বরাট সাহেবের চেম্বার। সাড়ে দশটা"।
রঙ্গন বললেন "রাইট"।
ফোনটা কেটে উপমন্যু পিয়ালীর দিকে তাকিয়ে বললেন "ডাক পড়ে গেছে। ব্রেকফাস্ট দিয়ে দাও। কেটে পড়ি"।
পিয়ালী উঠে রান্নাঘরের দিকে গেলেন।
তাতান বলল "বাবা, আজ কি তাড়াতাড়ি ফিরতে পারবে?"
উপমন্যু হেসে ফেললেন।
#
অফিসে ঢুকে উপমন্যু সরাসরি বসের চেম্বারে নক করলেন। বরাট রুমেই ছিলেন। উপমন্যু পারমিশন নিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকলেন।
বরাট বললেন "বোস বোস উপমন্যু। আই অ্যাম ইগার টু নো অ্যাবাউট এভ্রি ডিটেলস অফ ইওর কেস"।
উপমন্যু বললেন "শিওর স্যার। রায় এবং রঙ্গনকে ডেকে নি"।
উপমন্যু ফোন করতেই ইন্সপেক্টর রায় এবং রঙ্গন বরাট সাহেবের ঘরে প্রবেশ করলেন।

উপমন্যু বরাটকে বললেন "স্যার, আপনি খানিকটা জানেন কেসের ব্যাপারে। আমি তবু ব্রিফিং দিচ্ছি আবার। শিলিগুড়ির মেয়ে জয়িতা। কলকাতায় ঢাকুরিয়ায় পিজিতে থাকত। কলেজে থার্ড ইয়ারে পড়ত, একই সঙ্গে চাকরি করত এস আর জি ইনফোটেক কল সেন্টারে। মেয়েটি যেদিন খুন হয়, আমাদের ফরেন্সিক টিম ঘটনাস্থলে কোন ফিঙ্গারপ্রিন্ট পায় নি। পাথর জাতীয় কিছু দিয়ে মাথায় মেরে মেয়েটিকে হত্যা করা হয়। যে মোবাইলটা পাওয়া গেছিল সেটাও রিসেট করা ছিল। অত্যন্ত প্রফেশনালি খুনটা করা হয়েছিল স্যার"।
বরাট চোখ ছোট করলেন "তুমি মিন করছ কোন এজেন্সী বা ভাড়াটে খুনী খুনটা করেছিল?"
উপমন্যু বললেন "একজ্যাক্টলি"।
বরাট বললেন "ওকে। গো অন"।
উপমন্যু বললেন "ঘটনার তদন্তে নেমে দেখা গেল জয়িতার বাবা মা নিডি ছিলেন। মেয়ের চাকরিটা তাদের দরকার ছিল। অপর দিকে জয়িতাকে চাকরিটা পেতে সাহায্য করেছিল বিজনেস টাইকুন শঙ্কর মুখার্জির বখে যাওয়া ছেলে অনীশ মুখার্জী"।
বরাট বললেন "গিভ এন্ড টেক পলিসি, তাই তো?"
উপমন্যু বললেন "একদম। অনীশ বড় লোকের একেবারে বখে যাওয়া ছেলে। আমাদের সাসপেক্ট নাম্বার ওয়ান"।
বরাট বললেন "সাসপেক্ট কখন হল? মানে জয়িতা চাকরিটা নিয়েছিল কিন্তু তার পরিবর্তে যেটা দেওয়ার প্রয়োজন ছিল সেটা দেয় নি?"
উপমন্যু বললেন "হ্যাঁ স্যার। তারা গড়পঞ্চকোটে যায়, এবং সেখানে অনীশ জানতে পারে দ্য গার্ল ওয়াজ অলরেডি প্রেগন্যান্ট"।
বরাট চোখ বড় করলেন "ইন্টারেস্টিং। তারপর?"
উপমন্যু বললেন "সে রাতে শুধু অনীশ এবং জয়িতা গড়পঞ্চকোটে যায় নি। নীলম, মানে জয়িতার পিজি পার্টনার, সেও বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে গড়পঞ্চকোটে গেছিল। নীলমের ভারসান আর অনীশের ভারসান মিলিয়ে দেখেছি, সে রাতে অনীশ এবং জয়িতার মধ্যে একটা কথা কাটাকাটি হয়।অনীশের বক্তব্য ছিল জয়িতা তাকে ঠকিয়েছে। জয়িতা সে ঘর ছেড়ে নীলমের ঘরে আশ্রয় নেয়"।
বরাট বললেন "এই জেনারেশন প্রি ম্যারিট্যাল সেক্সে একটু বেশিই অভ্যস্ত। যাই হোক, আমরা টিকটিকি। আমাদের এসব না ভাবলেও চলবে। বল এরপরের ঘটনা"।
উপমন্যু বললেন "জয়িতার সঙ্গে এস আর জি ইনফোটেকে কাজ করত রুহি এবং আসিফ বলে এক কাপল। রুহি আসিফ পরস্পর অঙ্গীকারবদ্ধ, এদিকে জয়িতা কারণে অকারণে আসিফকে জড়িয়ে ধরত বলে রুহি জয়িতাকে সহ্য করতে পারত না। এই জড়িয়ে ধরা নিয়েই দীপাবলির রাত্রে আসিফ এবং জয়িতার কথা কাটাকাটি হয় যেটা পাড়ার মোড়ের দোকানদার দেখে। কিন্তু আসিফ এবং রুহির ডিটেলস যাচাই করে বোঝা যায় এদের মোটিভ স্ট্রং নয়। অন্তত জয়িতাকে খুন করার মত তো একেবারেই নয়"।
বরাট বললেন "বেশ। তবে? মেয়েটি যে বাড়িতে পিজি ছিল সে বাড়ির বাকিরা?"
উপমন্যু বললেন "ঢাকুরিয়ার হালদার বাড়িতে এখন থাকেন বাড়ির মালিক বৃদ্ধ সুশান্ত হালদার। প্রাথমিক কথোপকথনের পরে কোনভাবেই তাকে সন্দেহতালিকায় রাখা যায় না। বেঁচে থাকেন তার পুত্র বিশ্বজিৎ হালদার এবং তমালিকা হালদার"।
বরাট বললেন "এবং তাদের দুজনকে সন্দেহ করার কোন কারণ?"
উপমন্যু রঙ্গনের দিকে তাকিয়ে বললেন "অনীশ, বিশ্বজিৎবাবু এবং তমালিকাদেবীকে এ ঘরে আনো এবার"।
রঙ্গন ঘরের বাইরে গেলেন। মিনিট দুয়েকের মধ্যে তিনজন ঘরের ভেতর প্রবেশ করলেন। ঘরে ঢুকেই বিশ্বজিৎবাবু উপমন্যুর দিকে তাকিয়ে বললেন "এ কেমন অসভ্যতা অফিসার? আগে বলতে পারতেন, তাহলে অন্তত অফিসে ইনফরম করা যেত"।

উপমন্যু বললেন "তিনজনই বসুন"।
অনীশের চোখে মুখে ভয়ের ছাপ স্পষ্ট। সে চুপচাপ বসল। বিশ্বজিৎ এবং তমালিকা বসলেন।
উপমন্যু বরাটের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন "স্যার, আপনাকে প্রথমে বলেছিলাম, ঘটনাস্থলে একটি মোবাইল পাওয়া যায়, যেটা সম্পূর্ণভাবে ফরম্যাট করা হয়েছিল"।
বরাট বললেন "হ্যাঁ"।
উপমন্যু পকেট প্লাস্টিকে মোড়ানো একটা মোবাইল ফোন বের করে টেবিলে রেখে বললেন "এটি জয়িতার দ্বিতীয় ফোন। যেটা ঘটনাস্থল থেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং এই ফোনটির সিম জয়িতার নামে ছিল না"।
বরাট মাথা নাড়িয়ে বললেন "দ্যাটস দ্য সারপ্রাইজ। নাও আই আন্ডারস্ট্যান্ড"।
উপমন্যু হাসলেন।

।।আলোকের ঝর্ণাধারায়।।
উপমন্যু ফোনটা হাতে নিয়ে বললেন "এই ফোনটা না পেলে আমাদের ইনভেস্টিগেশনই শেষ হত না স্যার। বলা ভাল, এই ইনভেস্টিগেশনের কোন মূল্যই থাকত না। মানুষের রিপু, যে কতটা মারাত্মক হতে পারে, সে রিপু যে মানুষকে ঠিক কতটা দূরে নিয়ে যেতে পারে, তা হয়ত, এই মোবাইলখানা হাতে না পেলে জানাই যেত না। মোবাইলটা নষ্ট করার ইন্সট্রাকশন ছিল কিন্তু অত্যন্ত সৌভাগ্যবশত যার কাছে এই ইন্সট্রাকশনটা এসেছিল, সে তার লোভের বশেই, এত দামী ফোন ফেলে দেয় নি। সে ফোনটাকে তার কাছে অতি যত্নে রেখে দিয়েছিল। ভেবেছিল সব কিছু মিটে গেলে সে ফোনখানি ব্যবহার করা শুরু করবে। আমাদের জেরার শুরুতেই সে বেচারা ভেঙে পড়ে এবং কাল রাতের শুরুতেই এই মোবাইলটি আমাদের হস্তগত হয়। অতনু ভট্টাচার্য, রাজ্যসরকারী কর্মচারী, এবং একজন একজন অত্যন্ত সুদক্ষ প্রফেশনাল কিলার"।
বরাট উপমন্যুর দিকে তাকিয়ে হাসলেন "রিয়াল লাইফ বব বিশ্বাস? কোই দেখাও ভদ্রলোককে?"
উপমন্যু রঙ্গনের দিকে ইশারা করে বরাটের দিকে তাকিয়ে বললেন "বব বিশ্বাস এবং অতনু ভট্টাচার্যের মধ্যে পার্থক্য আছে। বব বিশ্বাস প্রফেশনাল কিলার ছিল এবং বরাবর ভদ্রতার মুখোশ পরে ঘুরত। অতনু এককালে রাজনৈতিক গুন্ডা ছিল। পরে পার্টি করার সুবাদে তার পুনর্বাসন ইত্যাদি হয়, সে তার জন্মভূমি বদল করে শিবপুরে চলে আসে এবং বিয়ে করে নতুন জীবন শুরু করে। বাইরের চেহারা ভদ্র। যদিও বদ দোষ তার এখানে এসেও যায় নি, বিভিন্ন যৌনপল্লী ঘুরে বেড়াত এবং সে দোষ অফিসের কারো কাছ থেকে সে লুকোতেও পারে নি কোন দিন। কথায় আছে গুন্ডাদের কোন দিন চুল পাকে না কিন্তু অতনুর চুল পেকেছিল। তার অত্যন্ত ধূর্ত স্বভাব তাকে আর সব কিছুর থেকে আলাদা করে দিয়েছিল"।
রঙ্গন অতনুকে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। অতনুকে দেখেই বোঝা যাচ্ছিল এক রাতে তার ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেছে। বরাট অতনুর দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে বললেন "মুখটা চেনা লাগছে। ভাঙরে ৯০ এর দশকে গণধর্ষণ এবং খুনের মামলায় ছিলি না তুই?"
অতনু মরা মাছের চোখ নিয়ে বরাটের দিকে তাকাল।
উপমন্যু বললেন "ঠিক ধরেছেন স্যার। হি ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট। এবং এখনও টাকার বিনিময়ে অপারেশন চালাত যদিও কাকপক্ষীতে সেটা বোঝার ক্ষমতা আমাদের কারো হয় নি"।
বরাট অনীশ, বিশ্বজিৎ এবং তমালিকার দিকে তাকিয়ে বললেন "এদের কেন এখানে আনা হয়েছে? এদের মধ্যেই কি কেউ খুনী?"
উপমন্যু বরাটের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বললেন "উদ্ধার হওয়া মোবাইলের ডেটা উদ্ধার করে অত্যন্ত ইন্টারেস্টিং তথ্য পাওয়া গেছে স্যার। পুজোর পরে বিশ্বজিৎবাবু জয়িতার ঘরে গিয়ে জয়িতাকে মলেস্ট করার চেষ্টা করেন"।

তমালিকা চমকে বিশ্বজিতের দিকে তাকাল। বিশ্বজিৎবাবুর মুখ নিমেষে ছাইবর্ণ ধারণ করল। তমালিকা উপমন্যুকে বললেন "আপনার কাছে এর কোন প্রমাণ আছে অফিসার?"
উপমন্যু বললেন "আছে। আপনি এই মুহূর্তে আপনার স্বামীকেও জিজ্ঞেস করতে পারেন, আশা করি উনি আপনাকে হতাশ করবেন না। কী বিশ্বজিৎবাবু? করবেন?"
বিশ্বজিৎবাবু তমালিকাদেবীর দিকে তাকাতে পারলেন না।
বরাট অস্ফূটে বললেন "অথচ এদের দেখলে ভদ্রলোক বলেই মনে হয়"।
উপমন্যু বললেন "একেবারেই। এই তথাকথিত ভদ্রলোকের মুখোশেই থাকে মলেস্টাররা আর তাদের জন্য আমাদের চারপাশটা প্রতিদিন বসবাসের অযোগ্য হয়ে ওঠে। বিশ্বজিৎবাবু জয়িতার ঘরে গিয়ে জয়িতাকে ওপেন অফার দেন। প্রথমে পাঁচ হাজার, এবং পরে দশ হাজার অবধি ওঠেন। শেষ পর্যন্ত জয়িতা তাকেও জানান যে সে প্রেগন্যান্ট। বিশ্বজিৎবাবু জয়িতাকে নষ্ট মেয়েছেলে ইত্যাদি বলে ঘরে ফিরে আসেন এবং এই পিজি ছাড়ার হুমকি দেন। এই পিজি ছাড়ার হুমকি দিয়েছিলেন ভাগ্যিস, নইলে খুঁজে পাওয়া ফোনের মেসেজ বক্স থেকে এই ঘটনাটা আমরা জানতেও পারতাম না"।
তমালিকার দু চোখ দিয়ে জলের ধারা নেমেছিল। উপমন্যু রঙ্গনের দিকে তাকিয়ে বললেন "ওকে মালবিকা ম্যাডামের রুমে নিয়ে গিয়ে বসাও। ওকে আপাতত আর এখানে রাখার দরকার নেই"।
বিশ্বজিৎ খানিকটা সামলে নিয়ে চেচিয়ে উঠলেন "কিন্তু আমি খুন করি নি। বিশ্বাস কর তমালি, আমি খুনটা করি নি"।
উপমন্যু রঙ্গনকে ইশারা করলেন। রঙ্গন ঘর থেকে বেরিয়ে একজন মহিলা কন্সটেবল নিয়ে এসে তমালিকাকে ঘর থেকে বের করে নিয়ে গেলেন।
উপমন্যু অনীশের দিকে তাকিয়ে বললেন "তোমার কিছু বলার আছে অনীশ?"
অনীশ ফ্যাকাশে মুখে বলল "আমি কিছু জানি না। আমি... বিশ্বাস করুন"।
উপমন্যু হাসলেন।
বরাট কৌতূহলী মুখে বললেন "এদের মধ্যে কে খুনটা করল উপমন্যু?"
।।দিনের শেষে।।
উপমন্যু বললেন " আবারও বলছি অপরাধী মনস্তত্ত্ব যে কতদূর যেতে পারে তা বোধ হয় এই কেসটা স্টাডি না করলে জানতে পারতাম না স্যার। কলকাতায় একা থাকা একটা মেয়েকে যখন বাড়িতে টাকা পাঠাতে হচ্ছে, নিজের লাইফস্টাইল ঠিক রাখতে হচ্ছে, তখন যে প্রলোভনগুলো তার সামনে আসছে, সে সবকে সামলানো যে কতটা কঠিন, তা বলে বোঝানো সম্ভব নয়। বিশেষ করে জয়িতার বয়সী মেয়েদের। এ প্রজন্মে মোবাইল আছে, তার সঙ্গে আছে প্রতিদিন নিজেকে আধুনিক প্রমাণের আপ্রাণ চেষ্টা। এই জালে যে জড়িয়েছে, সে বেরোতে পারে নি কখনই। কেসটার নিস্পত্তি কিছুতেই হত না, যদি না জয়িতার ঘরে দ্বিতীয়বার ইনভেস্টিগেট করতে গিয়ে আমরা এক্সাম প্রিপারেশন বইটা না পেতাম, আর সেখান থেকে এই অতনুর নাম্বার না পেতাম"।
বরাট বললেন "বুঝলাম না। আরেকটু খুলে বল"।
উপমন্যু বললেন "কোথাও কোন স্ট্রং ক্লু না পেয়ে হতাশ হয়ে আমি দ্বিতীয়বার জয়িতার ঘর সার্চ করার সিদ্ধান্ত নি। জয়িতার খাটের ওপর ছিল এক্সাম প্রিপারেশন বইটি। জয়িতা হয়ত কোন পরীক্ষা দেওয়ার প্রিপারেশন নিচ্ছিল। শুরু থেকে প্রতিটা পাতার প্রতিটা প্রবলেমই সে অ্যাটেম্পট করতে করতে যাচ্ছিল। একটা পাতা এল যেখানে জয়িতা আর কোন প্রশ্ন অ্যাটেম্পট করে নি কিন্তু সে পাতায় একটা ফোন নাম্বার খুঁজে পাওয়া গেল। সে নাম্বারের ডিটেলস বের করলে দেখা গেল নাম্বারটি দমদমের তন্ময় ভৌমিকের। তন্ময়বাবুকে জেরা করে নিশ্চিত হওয়া গেল নাম্বারটি বর্তমানে ব্যবহার করছেন অতনুবাবু। অতঃপর কাল

রাতে অতনুকে আটক করা। ওঁর থেকে জয়িতার দ্বিতীয়ফোনটা উদ্ধার করা এবং সেখান থেকে জানতে পারা জয়িতাকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য অতনুকে কে নিয়োগ করেছিল”।
বরাট অধৈর্য হয়ে বললেন “আরে তুমি তো ইন্ডিয়ান আইডল ঘোষণার মত সাসপেন্স রাখছ। কে অ্যাপয়েন্ট করেছিল?”
উপমন্যু হেসে বললেন “দ্য গ্রেট শঙ্কর মুখোপাধ্যায়”।
উপমন্যু কথাটা বলেই অনীশের দিকে তাকালেন। নামটা শুনে অনীশও যে চমকে উঠেছে সেটা উপমন্যু স্পষ্ট বুঝতে পারলেন।
বরাট অবাক হয়ে বললেন “মানে? মাঝবয়সে এসে?”
উপমন্যু বললেন “অনীশের জন্মের প্রায় সাথে সাথেই শঙ্করবাবুর স্ত্রী রমলা মুখোপাধ্যায় মারা যান। রমলাদেবীর বাড়ির লোকের অনেকেরই মতে স্ত্রী হাসপাতালে থাকা অবস্থাতেই শঙ্কর স্ত্রীকে খুন করিয়েছিলেন টাকা দিয়ে। শ্বশুরবাড়ির লোকের সঙ্গে তার ইগো ক্ল্যাশ ছিল। শঙ্করের নামে চার্জ শিট আনার সঙ্গে হয়ত সেই কেসটাও পৃথিবীর আলো দেখতে পারে। যাই হোক, আমি ইতিহাস না ঘেঁটে বর্তমানে আসি। এই অনীশ মুখার্জি চারিত্রিকভাবে অত্যন্ত দুর্বিনীত একটি ছেলে। কলেজে জয়িতাকে বিভিন্নভাবে জ্বালাতন করেছে, কুপ্রস্তাবও দিয়েছে। কিন্তু জয়িতার দিক থেকে সে সময়ে কোন রকম সাড়া পায় নি। যখন সে আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিল তখন অনীশ কোনভাবে জানতে পারে জয়িতা চাকরি খুঁজছে। সে সরাসরি জয়িতাকে সেই প্রস্তাবটা দেয়। জয়িতা অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে অনীশের প্রস্তাবে রাজি হয়। অফিস জয়েন করে।
জয়িতার ধারণা হয়েছিল শঙ্করবাবুকে অনীশের সম্পর্কে জানালে হয়ত কোন সুরাহা হতে পারে, সে সুযোগ খুঁজতে পারে এবং পেয়েও যায়। এখান থেকে এক অন্য গল্পের শুরু হয় যেটা আমরা এই মোবাইলটা উদ্ধার না করতে পারলে জানতেই পারতাম না”।
অনীশ চুপ করে উপমন্যুর কথা শুনছিল। বিশ্বজিৎও।
বরাট বললেন “কী প্রমাণ পেলে তুমি এই মোবাইলে”?
উপমন্যু বললেন “বিজনেস টাইকুন শঙ্কর মুখোপাধ্যায় অসম্ভব সংযমী জীবনযাপন করতেন। ব্যাপারটা এরকম ছিল না যে তার জীবনে প্রলোভন আসে নি। কিন্তু রমলাদেবীর মৃত্যুর পর সেসব প্রলোভনকে তিনি মাথায় চড়তে দেন নি। সমস্যা হল অনীশের বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে। শঙ্করবাবু বুঝতে পারলেন ‘নরানাং মাতুলাকৃতি’ কথাটির সারমর্ম। আমরা কেউই জানতাম না, শঙ্করবাবুর শ্বশুরবাড়ির লোকজন সুবিধের ছিল না। খানিকটা ট্র্যাপে ফেলেই রমলার সঙ্গে শঙ্করের বিয়ে দেওয়া হয়। নিজের ব্যবসা দেখার সঙ্গে সঙ্গে অনীশের বড় হওয়াটা দেখতে দেখতে শঙ্কর একটা সময়ে এসে বুঝতে পারেন তার ছেলেকে তিনি যতই মামাবাড়ি থেকে দূরে সরিয়ে রাখুন, তার ছেলে আদতে ওই বাড়ির লোকেদের মতই ইতর এবং কুলাঙ্গার তৈরী হয়েছে”।
অনীশ চেচিয়ে উঠল “মুখ সামলে অফিসার। আপনি জানেন না আপনি কার সম্পর্কে কথা বলছেন”।
উপমন্যু অনীশের দিকে তাকিয়ে বললেন “দেশের সংবিধানে সবাইকে সমানভাবে ট্রিট করার কথা বলা হয়েছে বুঝলে? অসভ্যতা কোর না। পুলিশের রুলের গুতো সম্পর্কে তোমার কোন ধারণা নেই, যাক গে...”
উপমন্যু বরাটের দিকে ফিরলেন “এই হতাশা শঙ্করকে কুড়ে খাওয়া শুরু করল। যার জন্য এত কিছু ছাড়লেন, সেই ছেলে সম্পর্কে বিভিন্ন জায়গা থেকে আসা রিপোর্ট তাঁকে মানসিকভাবে ভেঙে দিল এবং এই রকমই এক দিনে এস আর জি ইনফোটেকে অফিস ভিজিটে গেলে জয়িতা তাকে কোনভাবে একা পেয়ে তার ছেলে অনীশের কথা তাঁকে বলে। শঙ্করবাবু জয়িতায় জড়ানো শুরু করেন। যদিও অনীশ এ সম্পর্কে কিছুই জানত না। শঙ্করবাবু মধ্যবয়স্ক হলেও তার অ্যাপিয়ারেন্স, ম্যাগনেটিক পারসোনালিটি, সর্বোপরি প্রচুর সম্পদ জয়িতাকে মুগ্ধ করল অতি সহজে। এই দামী ফোনটি সম্ভবত শঙ্করবাবুই দিয়েছিলেন জয়িতাকে তার

সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্য। কলকাতায় এলে পাঁচতারা হোটেলে জয়িতাকে নিয়ে যাওয়া, ঘনিষ্ঠতা সবই হল এবং জয়িতা প্রেগন্যান্ট হয়ে পড়ল"।

অনীশ দু হাত দিয়ে নিজের মাথা চেপে ধরল।

উপমন্যু বললেন "এই ফোনের হোয়াটস অ্যাপ ব্যাক আপে রাখা মেসেজ দেখলে শঙ্করের সঙ্গে জয়িতার সম্পর্কের অনেকটাই বুঝতে পারবেন। মধ্যবয়স্ক শঙ্কর রীতিমত টিনেজদের মত জয়িতার সঙ্গে প্রেম করতেন। খেয়েছ নাকি, কিংবা তোমাকে রাণী করে রাখব টাইপ কথাবার্তাও খুঁজে পাওয়া যাবে এই কনভারসেশন থেকে। সেলফি এক্সচেঞ্জ থেকে শুরু করে সবই হত"।

বরাট হেসে ফেললেন। উপমন্যু আড়চোখে অনীশের দিকে তাকিয়ে বলতে শুরু করলেন, "এদের সম্পর্কে সমস্যাটা শুরু জয়িতার প্রেগন্যান্সির পর থেকে। শঙ্কর বার বার জয়িতাকে অ্যাবর্ট করতে বলেন। জয়িতা ভেবেছিল শঙ্কর হয়ত তাকে বিয়ে করবে। অনীশের বাপের থেকে পজিটিভ রেসপন্স না পেয়ে জয়িতা বুঝে উঠতে পারে না কী করবে। শঙ্কর সে সময়টা জোহানেসবারগ যান। জয়িতা ফোন করে করেও শঙ্করকে পায় না। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে জয়িতা ঠিক করে শঙ্করের সব কীর্তির কথা অনীশকে বলবে"।

বরাট বললেন "ওহ, রিভার্স সাইকোলজি?"

উপমন্যু বললেন "একজ্যাক্টলি স্যার। অনীশকে সব কিছু বলার জন্য জয়িতা গড়পঞ্চকোটে যায়, সঙ্গে নিয়ে যায় তার পিজিমেট নীলমকে, কিন্তু এ ছেলে ঘরে ঢোকার পর জয়িতার কথা শোনার আগেই শারীরিকভাবে জোরজারি শুরু করলে জয়িতা জানিয়ে দেয় সে প্রেগন্যান্ট এবং নীলমের ঘরে আশ্রয় নেয়। অনীশের ওপর সে এতটাই বিরক্ত হয়ে গেছিল যে অনীশকে আর কিছু বলতে পারে নি। যাই হোক, এর পরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত, আসিফ এবং রুহির সঙ্গে গিয়ে জয়িতা বাচ্চা নষ্ট করে। কিন্তু শঙ্করকে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারে না। ব্ল্যাকমেল করা শুরু করে। শঙ্কর মুখোপাধ্যায় ব্যবসার ব্যাপারে এত জবরদস্ত হলেও সম্পর্কের এই কঠিন পরিস্থিতিতে মাথা ঠিক রাখতে পারেন না। ঠিক করেন জয়িতাকে সরিয়ে দিতে হবে। অতনুকে অ্যাপয়েন্ট করেন। শঙ্কর দেশের বাইরে ছিলেন। ওখান থেকেই জয়িতাকে ফোন করে অতনুর নাম্বার দেন। তাড়াহুড়োয় দেওয়া নাম্বার জয়িতা এক্সাম প্রিপারেশন বইতে লিখে রাখে। শঙ্কর জয়িতাকে জানান সায়েন্স সিটির কাছে অতনুর সঙ্গে দেখা করতে। অ্যাবরশনের ক্ষতিপূরণ বাবদ বেশ কিছু টাকা তিনি অতনুর হাত দিয়ে পাঠাবেন। সে টাকা নেওয়ার জন্য জয়িতা অতনুর সঙ্গে দেখা করতে যায় অফিস না গিয়ে এবং অতনু এরপরে যা করার করে। তবে যাই বলুন স্যার, কে যে বলে মেয়েদের পেটে কথা থাকে না, এই ফোন নাম্বার এবং অতনুর কাছ থেকে ফোনটা উদ্ধার না হলে কার সাধ্যি ছিল জানার যে শংকরের সঙ্গে জয়িতার আদৌ কিছু ছিল। জয়িতার কোন বন্ধু, অফিসের কেউ, কিচ্ছু জানে না। শি ওয়াজ আ পারফেক্ট সিক্রেট কিপার"।

বরাট চোখ ছোট ছোট করে অতনুর দিকে তাকিয়ে বললেন "শঙ্কর মুখার্জির সঙ্গে এর আগে তোর কতবার ট্রানজাকশন হয়েছে?"

অতনু উত্তর দিল না। মাথা নিচু করে নখের দিকে তাকিয়ে রইল।

উপমন্যু বললেন "সেসব বের করার দায়িত্ব আমরা রঙ্গনের ওপর ছেড়ে দিতে পারি স্যার"।

বরাট বললেন "তা বটে। কেসটা স্ট্রং বানাতে হবে বুঝতেই পারছো। শঙ্কর মুখোপাধ্যায় দেশের সেরা ল ইয়ার নিয়োগ করার ক্ষমতা রাখেন। তিনি আছেন কোথায় এখন?"

উপমন্যু বললেন "প্যারিসে। দেশে ফেরামাত্রই গ্রেফতারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মোরাল অফ দ্য স্টোরি কী জানেন স্যার, মেয়েটার শরীরটা স্বাদু ছিল প্রথমে, মেয়েটা প্রেগন্যান্ট হতেই সেটা বিস্বাদ হয়ে গেল। জাস্ট ভাবুন, এই অনীশ কিংবা বিশ্বজিৎবাবুদের মত লোকেরাও যখন জানতে পারল মেয়েটা প্রেগন্যান্ট, তখন বিকর্ষণ বোধ করল"।

বরাট চেয়ারে হেলান দিয়ে বললেন “তা নয় উপমন্যু, বরং বলতে পারো সেক্সুয়ালি এরা অতটাও পারভারট নয়। প্রেগন্যান্ট মেয়ে কি রেপ হয় না? হয়। তবে এটা বলতে পারো, শঙ্করের মত লোকের কাছে জয়িতার শরীরটা বিস্বাদ হয়ে গেছিল। সাচ আ স্ট্রেঞ্জ ক্যারেক্টার হি ইজ। ওঁর মত লোক এসকরট... থাক...”।
উপমন্যু অনীশের দিকে ফিরে বললেন “বাবাকে ফোন কর। খবর নাও কবে ফিরবেন। আর কিচ্ছু বলবে না”।
অনীশ মুখ শক্ত করে বলল “আমি পারব না”।
বরাট জোরে ধমক দিলেন “উপমন্যু যা বলছেন তাই করুন। নইলে এমন অবস্থা করা হবে বুঝতে পারবেন কলকাতা পুলিশ কী জিনিস”।
অনীশ থতমত খেয়ে বলল “আমার ফোন জমা নেওয়া হয়েছে”।
উপমন্যু রঙ্গনের দিকে তাকালেন। রঙ্গন বেরিয়ে গেলেন বরাটের চেম্বার থেকে। কয়েক মিনিট পরে অনীশের ফোন নিয়ে হাজির হলেন।
অনীশ বলল “বাবা এখন ওঠে নি”।
উপমন্যু বললেন “ফোন কর। ওঠাও”।
অনীশ কাঁপা কাঁপা হাতে শঙ্করের নাম্বার ডায়াল করল। কিছুক্ষণ পর বলল “ধরছে না ফোন”।
উপমন্যু বললেন “সঙ্গে কে যায়? জানো? তাকে ফোন কর”।
অনীশ উপমন্যুর দিকে তাকিয়ে আবার কারো একটা নাম্বার ডায়াল করল। এবারে ওপাশ থেকে ফোন ধরল, অনীশ বলল “বাবাকে দাও তো। বাবা ফোন ধরছে না”। ওপাশ থেকে কোন একটা উত্তর এল। অনীশের হাত থেকে ফোনটা পড়ে গেল।
রঙ্গন এগিয়ে গিয়ে ফোনটা তুলে উপমন্যুর হাতে দিলেন।
উপমন্যু ওপ্রান্তের কথা শুনে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বরাটের দিকে তাকিয়ে বললেন “শঙ্কর মুখোপাধ্যায় খানিকক্ষণ আগে হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছেন স্যার”।
বরাট উপমন্যুর দিকে নিস্পলক চোখে তাকিয়ে বললেন “অপরাধবোধ? নাকি অবচেতনে ভয়”।
উপমন্যু অনীশের দিকে তাকিয়ে বললেন “সে যাই হোক, এখন একটা কথাই মনে পড়ছে। কারো পৌষ মাস, কারো সর্বনাশ। মুখার্জি ইন্টারন্যাশনালের সর্বেসর্বা এখন এই রাস্কেলটি”।
অনীশ দু হাতে মুখ ঢেকে বসে থাকল।
#
দরজা খুলে পিয়ালী উপমন্যুর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন। বললেন “আমি কি স্বপ্ন দেখছি?”
উপমন্যু ঘরের ভেতর ঢুকে বললেন “তাতান আছে?”
পিয়ালী বললেন “এই এল”।
উপমন্যু বললেন “চল। কোথাও খেয়ে আসি। অনেকদিন বাইরে খাওয়া হয় না”।
পিয়ালী বললেন “চিমটি কাটো দেখি। বিশ্বাস হচ্ছে না আমার। তুমি সত্যিই তো? নাকি আমি স্বপ্ন দেখছি”।
উপমন্যু বললেন “চল চল। দেবু বসে আছে। ও ব্যাটাও রোজ রোজ পেটচুক্তি ভাত আর ব্লেড দিয়ে কাটা মাছ খেয়ে খেয়ে ক্লান্ত। চল খেয়ে আসি”।
পিয়ালী উপমন্যুর দিকে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে তাতানকে ডাকতে ঘরের ভেতর গেলেন।
উপমন্যু হাসতে হাসতে সিগারেট ধরিয়ে বললেন “কারো পৌষ মাস... কারো সর্বনাশ... কারো পৌষ মাস... কারো...”
(শেষ)